অকাল বোধন ও অন্যান্য গল্প

অকাল বোধন ও অন্যান্য গল্প

শংকর বসু

রায় এণ্ড চৌধুরী
৮।২ হেস্টিংস্ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০১

প্রথম মুদ্রণ, অগাষ্ট, ১৯৬০

প্রকাশক / রায় এণ্ড চৌধুরী
৮।২ হেস্টিংস্ স্ট্রীট
'কলকাতা ৭'০০০০১

মুদ্রক / রূপলেখা
২২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

বহরমপুর জেলে যাকে পিটিয়ে হত্যা
করা হয়েছে সেই তিমির এবং
অন্যান্য শহীদদের উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

ভাতের উপাখ্যান

যন্ন নাহি মিলে এই পাপ জষ্ঠী মাসে
বেঙছির ফল খেএ্যা থাকি উপবাসে।

মুকুন্দরাম

•

নানান বর্ণের চাল। সেদ্ধ আর আলা দুইই আছে। কাঞ্চা সোনার বরণ। আবার ধুলোবালি মরাহাজা পাতার মতো কেমন ধূসর চাট্টি। মেটে হাঁড়িতে চালগুলো ঢেলে দিয়ে, কেদার ঝুল ঠোঁটে গর্বের আধা হাসি জাগিয়ে বুঁচির দিকে তাকাল। মানে, ফোটাও না কেন। এক্ষুনি কোলেরটার হাসির মতো কথা বলবে চাল। টগবগ টগবগ শব্দে। এককোনে বুড়ি মা-টা কাতরাচ্ছে। পেটের আগুন সর্ব শরীলে ছড়িয়ে গ্যাছে। ডেলা পাকিয়ে পড়ে আছে এখন। ঐ আগুনে যদি চাল কটা ফোটানো যেত—তাহলে আর চিন্তে ছিল না। ছিনিয়ে আনার খাটনি পুষিয়ে যেত। এখন ফোটানোটাই সমস্যা।

পেটের কাঁচা ভুখ নিয়ে লেণ্ডিপেণ্ডি বাচ্চাগুলো মৌলালীর ফুটপাতের কানায় মুখ গুঁজে, হলদে চোখের জমিতে নিকষ কালো মণিগুলো ভাসিয়ে রেখেছে। ভাত হলে চাট্টি খাবে। হাউস মিটিয়ে। খানিক আগে এক পশলা বইয়ে দিয়েছে আশমান। কেদারের পরিবারটা হাঁড়ি পাতিল ন্যাকড়াকানি সমেত ভিজে নেয়ে উঠেছে। এখন ন্যাতার মতো। চাল চাট্টি পেয়ে আবার কেমন নড়নচড়ন শুরু হয়েছে। ছানাপোনাগুলোরও বিশ্বেস হচ্ছে—না, পেটে যাবে দু এক দলা। মৌলালীর ফুটপাতের ওপর ন্যাকড়াকানি আর চাট্টি খড় বিছিয়ে কেদার সংসার পেতে বসেছে দু হপ্তা হতে চলল। এর মধ্যে আরো যে কত ফুটো কপাল এল তার আর হিসেব নেই। বুঁচি ন বছরের দুবলাপাতলা ছেলেটির হাত ধরে এক ঝাঁকানি দিল: এ্যাই! পেটটা তো করিছিস এই এততো বড়!

ছেলেটা পেটটা নিয়ে আইঢাঁই করছিল। প্রকাণ্ড জালার মতো পেট। জয়ঢাক একটা। দেশগাঁয়ে থাকতে বুঁচি 'কিসব পাতা বাটাবুটি করে প্রলেপ দিত, তাইতে কমত একটু। দেড় হপ্তার ওপর সেসব বন্ধ। পেটটা খালি থাকলে আবার ফোলে বেশী। নারকেল দড়ির মতো ছেলেটার হাত-পা লুললুল করছে। যেন খসে যাবে।

চিলের মতো সাঁ করে ছুটে গ্যালো। পিলেটা পটলের মতো ফুলে ওঠে ছোটার ধকলে। হঠাৎ মৌলালীর ট্রাফিক কনস্টেবলটার লেবু লাগানো বুটের কাছে পিলেটা নিঃশব্দে ফেটে যেতে পারে। ছেলেটার ওসব হুঁশ নেই। ফুটা-ফাটা টুকরো টাকরা কাগজ তাক করে ছুটে যাচ্ছে। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এসে ফুটপাতের কোনটায় ঢেলে দিচ্ছে।

দুখানা ইট আড় করে সাজিয়ে বুঁচি আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। একটু করে জ্বলে আর চুনাচানার চোখগুলো চক চক করে ওঠে। শেষে আগুনটা টিঁকে গ্যালো। আধলা কালোপোড়া ইটের ফাঁকে জিভের মতো লকলক করে উঠল আগুনের একটা আলগা শিখা। একেবারে সদ্য যেটা মাটিতে পড়েছে, সেই কোলেরটা সেদিকে তাকিয়ে থাকল মানুষের প্রথম আগুন আবিষ্কারের বিস্ময় নিয়ে। বুঁচির চোখ দুটোয়ও কেমন একটা মুগ্ধভাব। যেন আগুনের বন্দনা করছে। অগ্নি, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। কুণ্ডলী পাকিয়ে বুড়ী পড়েছিল। আধলা ইটের ফাঁকে লাল টকটকে ফিতের মতো আগুনের দিকে তাকিয়ে বুড়ী পিচুটি-পড়া চোখ দুটো সেঁকে নিচ্ছিল।

খানিক ছুটোছুটি করে ছেলেটা কাহিল হয়ে পড়ল। লাইট পোস্টটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। পিলেটা নড়ে চড়ে উঠছে। যন্ত্রণায় জিভ ঝুলিয়ে দিল ছেলেটা। ওর গালের পাতলা কাটা দাগটায় এখন দুশ্চিন্তার এক গভীর ছাপ। ভুরু জোড়া কুঁচলে গ্যালো আপনি। আনমনে নাক খুঁটে পোস্টটার গায়ে হাত মুছল।

আধলা ইটের ওপর মেটে হাঁড়িটা কাত হয়ে আছে। হাঁড়িটার গায়ে কালসিটে দাগ। পাতলা ধোঁয়ার রেখা জাগছে। তরিতরকারির ছালবাকল খোসা আর খুদকুঁড়ো দুমুঠো চাল ফুটছে ঢিমেতালে। থিতিয়ে থিতিয়ে। উষ্ণ এক থাল ভাতের নিবিড় স্বপ্ন পাঁজরার হাড়ে গেঁথে একগাদা বালবাচ্চার মা বুঁচি

বুকের ওপর ন্যাতাটা টেনে, সারাটি পিঠ আলগা করে খর রোদ্দুরে মেলে রেখেছে। দাঙ্গাবাজ, ফেরেববাজ, লুটেরা শহরটার বুকে, ফুটপাতের কানায়, মরা গাছের ছায়ায়, মৌলালীর পাইপ পাড়ার মাজা ভাঙা কাজিয়ার ভেতর দুমুঠো চাল ফোটে বেআইনী দুঃসাহসে। ভাতের একটা আশ্চর্য গন্ধ ভাসে বাতাসে।

চালটা মেলাই ফুট খায়। ওদিকে আগুনের অবস্থা যাই যাই। ছেলেটাকে আবার ছুটতে হল। কেদার চালচাটি যোগাড় করে দিয়ে ফের কোন চুলোয় গ্যাছে। জরোবুড়ী পেটের জ্বালায় আলজিভ বের করে ফেলেছে। কাতরাচ্ছে। নাহ্, মরার আগে আর এক গেরাস মুখে দিয়ে যেতে পারল না। নিভন্ত আগুনে ফুক মেরে মেরে বুঁচি দম বন্ধ হয়ে মরার দাখিল।

দূর থেকে ছেলেটা খানিক দেখল ঠায় দাঁড়িয়ে। তারপর পিলেটা চেপে ছুট্‌টে গ্যালো কর্পোরেশনের দেয়ালটার দিকে। পেচ্ছাপের ভিজে মাটিতে দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে পোষ্টার ছিঁড়তে লাগল। ফাতা ফাতা করে। পার্টিপুর্টির বাছবিচার না করে। ওর রাক্ষুসে খিদের আগুনে পুড়ে খাক হবে বলে তেরো-চোদ্দ কিসিমের পার্টির প্রচার অভিযান টুকরো টুকরো হয়ে জমা হল। পেটের পিলের ওপর খানিকটা তুলে নিয়ে এসে বুঁচির সামনে ঢেলে দিয়ে গ্যালো। আর আট দশটা বালবাচ্চার মা বুঁচি শহরের বুকের মাঝখানটায় ফুক মেরে মেরে আগুন জ্বালাতে লাগল। পেটের আগুন নেভাবে বলে। সয়-সন্তানের মুখে দুটো দেবে বলে।

ভাতের আঁশ আঁশ গন্ধটা ফের বাতাসে ছড়িয়ে গ্যালো। ফুটে এসেছে। তবু ছেলেটার কেমন যেন রোখ চেপেছে। আবার পোষ্টার ছিঁড়তে চলল। কাগজগুলো ফাতা ফাতা করে ছেঁড়ার মধ্যে কেমন একটা মজা আছে। বুঁচি মানা করল। ছেলেটা কানে নিল না। কুচিকুচি করে একমনে ছিঁড়তে লাগল। হঠাৎ কোত্থেকে মেচেতার ছাপভরা মুখ নিয়ে একটা লোক ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে শূয়োরের মতো ছুটে এল—শ···শা···লা জানিস কাদের পোষ্টার। ছেলেটা জানত না। ওর জানার দরকার হয়নি। ওর দরকার ছিল শুধু আগুন জ্বালা। এসব কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না। গোল্লাগোল্লা চোখে তাকিয়ে থাকল মেচেতার দিকে। লোকটা ততক্ষণে পিলেটার ওপর এক

ঘুষি লাগিয়ে দিয়েছে। ন বছরের ছেলেটা বেদনা হজম করে থুতু ছেটাতে লাগল।

—শালা…হারামী…

বুঁচি ততক্ষণে হাঁড়িটা ইটের ওপর থেকে নামিয়েছে। ধোঁয়া উঠছে এখনও। অল্প অল্প। আর হাঁড়িটা নামাতেই কোত্থেকে কেদার ছুটে এল। হাঁড়িটা আগলে বসল, কাঁচা একটা খিস্তি করে। বাচ্ছাগুলো হাড়গিলে মানুষটার বুকে আঠালি পোকার মতো ল্যাপটে থাকল। বুঁচি উবু হয়ে বসেছে, হাঁটুতে থুতনি রেখে। উষ্ণভাত ঢেলে দিতে লাগল ভাঙা ঝুরঝুরে একটা কলাই করা পাত্তরে। আর কাচ্ছাবাচ্ছাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মুখ পুড়িয়ে ফেলছে। খেতে খেতে কেদার কি যেন বলল কদ্ কদ্ শব্দে। দোক্‌নে টানে।

: পেলি কি করি।

: সেগোর হোমগার্ডটাকে একের ঘুষো দে·।

লেণ্ডিপেণ্ডি বাচ্ছাগুলো বাপের সাথে সমানে গলা তুলে হাসতে লাগল। তার সেই গাঁ ছাড়া চাষীবৌ নিজের মরদটার দিকে কেমন একটা বিস্ময় আর শ্রদ্ধা নিয়ে দেখতে লাগল। আধলা ইটের ফাঁকে আগুনের দিকে যেমন করে তাকিয়েছিল। এবার নিজেও মুখে তুলল। আবার খাওয়ার কদ্ কদ্ শব্দ। পেটে দানা দেওয়ার ওপছানো খুশী থেকে থেকে বালবাচ্ছাগুলোকে চঞ্চল করে তুলছে। আর ওদের বাপ ভাতের উপাখ্যান, হোমগার্ড ঠ্যাঙানোর গল্পোটা হাজারবার ধরে নানানভাবে বলে চলল : হুঁ…হুঁ…সেগোর হোমগার্ড…এই একের ঘুষিতে…। জরোবুড়ীও কাঁপতে কাঁপতে এসে থালাটায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। ন বছরের ছেলেটা কেবল অসহ্য পিলের যন্ত্রণায় দাপাচ্ছিল। চান্দের টিপের মতো আঙুল দিয়ে ভাত খুঁটে নিল দেড় বছরের কোলেরটা। হঠাৎ খাওয়ার কদ্ কদ্ শব্দ ছাপিয়ে এক বিকট শব্দে ছেলেটার পিলে পেট ফালা করে ভাতের থালার ওপর গিয়ে পড়ল। সাথে সাথে ফটফটা সাদা ভাতগুলো লাল হয়ে গ্যালো। উষ্ণ তাজা রক্তে।

সাত ধাক্কা করে অমন সাধের ভাত পেটপুরে খেতে পেলনা ছেলেটা। বুঁচি ফুটপাতের ওপর মাথা কুটে ফাটিয়ে ফেলল। ভাতের হাঁড়িটা ভেঙে গুঁড়িয়ে

গ্যাছে। মরা আগুন থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে। ভাত রান্নার চিহ্ন পোড়া ইঁট দুটো পোকায় খাওয়া দাঁতের মতো পড়ে আছে।

আর ওদের শোকের চিহ্ন নিয়ে আদিম অন্ধকার থেকে উঠে এল চার চাকার একটা কালোগাড়ী। গোটা পরিবারটাকে ভ্যানের খোলের ভেতর ঠেসে নিয়ে চলল। ভাত রান্নার এই আশ্চর্য কাহিনী শোনার জন্য। বাড়া ভাতের দুঃসাহসী দুঃস্বপ্ন আর ভাঙা কলাইয়ের থালার কানায় কানায় লেপটে থাকা পিলে ফাটা রক্তের জবাবদিহির জন্যে। কারণ বহুকাল যাবৎ এ শহরে রক্তপাত নিষিদ্ধ।

কিংবদন্তীর শহর

জন্মেই মাকে খেয়েছিল। নিবারণকে গভ্ভে ধারণ করে হতভাগ্য জননী তাকে শরীলের কোষ নিংড়ে দিল : রস, কষ, মেদ, মজ্জা। দিয়েথুয়ে নিংসাড়ে মরে গ্যালো। মিত্যুকালে নিবারণ মা'র চিমসে বুকে দু দুটো দাঁত বিঁধিয়ে দিয়েছিল। আবাগী মার বুকে পুরুলিয়ার ঠা ঠা রোদ। মাটিতে পানি নেই। বুকে দুধ নেই। বুক যেন মাটি। আশ্চয্যি, ছেলেটা বেঁচে গ্যালো! সেরেফ্ খারকোল পাতা বাটা আর কচুর লতি সেদ্ধ খেয়েই ছেলেটা বর্ষার ফনফনানো কচুর মতই গতরে বেড়ে উঠল। গলাজল বিলে পাট পচান দিত নিবারণ। জউক লাগত মোটা চামে। হাসুয়ার টানে সাফ করত জউকের খুন খাওয়া বেলুনের মত পেট। বাপের বুকশূল ছিল। ডাক এল, আর মানুষটা ধড়ফড়িয়ে চলে গ্যালো। নিবারণ বেঁচে রততে থাকল চোদ্দ পুরুষের পরমায়ু নিয়ে।

দুর্ভিক্ষ গ্যালো; স্বাধীনতা গ্যালো, যুদ্ধ গ্যালো : সব্বোনাশের মাথায় পা দিয়ে নিবারণ শহরে এল। শহরের কাছে তার অনেক প্রেত্যাশা! কলিকাতা শহর! হাটুয়া, ব্যাপারী আর ন্যাড়াপাড়ার মঙ্গল খুড়োর কাছে ওড়া-ওড়া অনেক খবর শুনেছে। মঙ্গল খুড়ো গলার শিরা দাঁত কপাটি লাগিয়ে ঘিঁচে টানে আর ছাড়ে। একসাথে শিরাগুলো জেগে উঠলে তবে কথা সরে : বুজলিরে নিবারণ, কলিকাতায় পয়সা উড়ে বেড়ায়···মানুষের প্রাণের মূল্য আছে সেখানে, অনেক মূল্য।

দশ ক্রোশ পথ হাঁটার ক্লান্তি, শূন্য পেটের জ্বালা উগ্র নেশায় ঝিম পাড়িয়ে রাখল মানুষটা : কেবল মঙ্গল খুড়োর কথা স্মরণ করতে করতে বেমালুম চলে এল।

নয়া মানুষের যা হয়। প্রথমে ধাঁধা। আখমাড়াইয়ের কলের মাফিক দিন নেই রাত নেই মানুষ যুঝছে। কত কাজ! রাত্তিরে বিজলী বাতিতে দিন বানিয়ে বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে। ধাঁধার ঘোরেই সাত ঘাটে ঠোক্কর খেল। মানুষের মেদ, মজ্জা, তরল রক্ত এই শহরে ন্যায্য দামে বিক্রি হয়। মানুষ ফ্যালনা নয়। হাড় অব্দি বিকিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে নিবারণ এসব টের পেয়ে গ্যালো। সাত ঘাটের জল খেয়ে স্যায়না হয়ে উঠল। একেবারে জবরদস্ত। কাজকাম জোটাতে বিস্তর ভোগান্তি হয়েছে। তার আগে একবার সে রক্ত বেচেছিল। আর মনে মনে ভেবেছে—সত্যি পয়সার পাখনা আছে বটে। কঠিন শহর। আর মানুষগুলো আশমানের কইতরের মতো মুক্ত। যেমন খুশি, যেমন মর্জি, বাঁচো। বড়োলোক অব্দি খনা গলায় শ্যামসুন্দরের পালার মতো পিরিতের গান গায় পেঁচিমাতাল বনে। ফেলাট হয়ে। আর গরিব দুঃখী তেমন ঠেকলে মাথার চুলগাছ অব্দি বেচতে পারে।

নসিবের ফেরে রবার কলের কামটা জুটে গেলে, নিবারণের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বিন্দা দারোয়ানের খুপরির বাইরে মেঝেতে রাতটা গড়িয়ে নিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে। কামানের নলের মতো চিমনি। সারি সারি। খাড়া উঠে গ্যাছে। শান্ত উদার আকাশটাকে ফেড়ে ফেলার কুটিল শলা পরামর্শ করে। বলক বলক ধোঁযাও ওগরায়। চিমনির তলায় স্যাঁৎসেঁতে টিনের শেড। ঢালু। শেডের তলায় মানুষজনের জান লেডিকুত্তার জিভের মতো ঘামে। টস টস করে নোনা পানি গড়ায়।

—আসলি কেন?

—উপায়!

—মানুষ মরে ভূত হয়ে যাচ্ছে!

—গরিব গরবার অত দেখলে চলে না, অসুখ বিসুখ সব জায়গাতেই আছে।

—অসুখ বিসুখ নয়রে শালা।

—তবে?

—ছারপোকার মতো মানুষের জান নোখের ডগে, একটু টিপলেই ব্যস।

রবার কারখানার ঘন্টি বেজে উঠল। শিবুদা কালো ছোপ ধরা মাড়ি ভেটকে, গোলগোল চোখ দুটো চোয়ালের দিকে টেনে কথা বলছিল। ঘন্টি হতেই কথা কেটে দিল। ঘন্টিটা একনাগাড়ে খানিক বাজে টং টং শব্দে। সাথে সাথে ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ তুলে গেটটা বোয়াল মাছের মুখের মতো ফাঁক হয়ে যায়। তার দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এনামেলের গেলাস বেঁধে রেখেছে। টিফিন হলেই গেলাস নিয়ে ছুট লাগায় সব। শিবুদা গেঞ্জির দুটো ফুটো গিঁট দিয়ে বেঁধে, আঙুলের ডগায় গেলাসের তারটা পেঁচিয়ে ছুটল। নিবারণ চেল্লাতে লাগল : দশ পয়সার মুড়ি এনো গো···।

শিবুদার বাত্তি ধরে গেছে। ষাটের ঘরে বয়স। পেট শুখনো দিয়ে দিয়ে আরও বুড়িয়েছে। দশ পয়সার চা আর তিনটে বিড়ি মাত্তর তার খরচা। আবার রুটিন বেঁধে নিয়েছে, হপ্তায় একদিন নির্জলা। চা মুড়ি নিয়ে এসে শিবুদা ঠোঙাটা নিবারণের দিকে আগিয়ে ধরল। একমুঠো মুখে দিয়ে এক ঢোক চা গিলেই ফের শুরু করল।

—তবে শোন্ বলি···এই যে এত্তো মানুষকে খুন করল, সেসব রক্ত কোথায় গ্যালো ?···এ্যাঁ·· কেউ বলতে পারবে না···।

শেষের দিকটা শিবুদা টেনে টেনে বলে। তারপর গাঁটপাকানো থ্যাবড়া আঙুল বেচালভাবে নাড়ে। হঠাৎ কথা কেটে দেয়।

॥ ৩ ॥

ক্যাচ ক্যাচ শব্দে কোৎ পেড়ে পেড়ে হাসতে লাগল শিবুদা। নিবারণ বিশ্বেস যায় না। ডর লাগে তবু। শহরটা কেমন যেন ঝিম মারা। গলি-ঘুঁজিতে চোরের মতো আনধার হাঁটে। শিবুদার হাসিটা ভয়ানক।

—শিবুদা ! অ শিবুদা !

ফ্যাচ ফ্যাচে হাসিতে নাকে জল এসে গেছিল। লম্বাঝুল সার্টের কানায় নাক পুঁছে জিজ্ঞেস করল : হাবড়ার বিরিজ দেখেছিস ?

—হুঁ।

—বল্ দেখি কেমন করে বানালো ?

—লোহা, নাট বল্টু…।

—তোর মুণ্ডু !

—তবে ?

—কচি ছেলের রক্ত লেগেছিল।

—ধ্যুৎ !

—না হলে বিরিজ কি অমনি হলো

—তোমার যেমন কথা…।

—হক কথা। তখন বাণিজ্যের জন্য সাহেবরা লালচে মরছে। দালালদের নগদ ট্যাকা দিল। তারা কালো কালো বাগ্দির ছেলে এনে দিল।

নিবারণের তিন কুলে কেউ নেই। মার বুকে বাণ মেরে জোঁকের মতো সব দুধ শুষে নিয়েছিল শত্তুর। সেই বুকে তার বিষম তাগিদে কচি দাঁত বিঁধিয়ে যে বেঁচে থাকল, মরণকালে বাপ তাকে বলেছিল : নিবারণ আমার বংশ যেন থাকে। সব বিরিক্ষই ফল রেখে যেতে চায়। তবে না মানুষ বেঁচে আছে। না হলে বিরিক্ষ মলে থাকেটা কি ! নিবারণ বাপের কথা স্মরণ রেখেছিল। বংশরক্ষা আর বংশবৃদ্ধির জন্য সে এই শহরে এসেছিল। এই শহরের কাছে তার অনেক প্রেত্যাশা।

ঘ্যাসপাড়া বস্তিতে শিবুদা ঘর দেখেছিল। কাকভোরে উঠে চ্যান করেই ছোটে। এসে জুটো গেলে। শিবুদা ফিরতি পথে দু একদিন এসে নানান কথা বলে।

—নিবারণ !

—হুঁ।

—সাহেবরা কি করতো জানিস ?

—কি ?

—মানুষ বেচতো। জলজ্যান্তো মানুষ।

—দূর।

—দূর দূর দেশে চালান দিত।

—তুমি পাগল হলে শিবুদা!

—আরে সে জন্যেই তো জব চার্ণক শহরের পত্তন…।

—তুমি থামবে?

—পালা! পালা!

নিবারণ ভয় পাওয়ার পাত্তর নয়। তাছাড়া এই সত্তর সালে সে স্বচোক্ষে দেখেছে সাহেবসুবোর মূর্তি ঘর্ঘর শব্দে ক্রেন দিয়ে হ্যাঁচড়ে টেনে তুলতে। ক্লাই-ভের মূর্তি সরিয়ে ক্ষুদিরামের শ্বেত পাথরের মূর্তি বসাল। তবু শিবুদার হাড় জ্বালানো কথায় বুকটা ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

মজুরের তেল কালি বারোমেসে তকলিফ্ আর চিমনির ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় বিষণ্ণ আকাশ। শহরের মাথার ওপর আকাশ। আকাশে ধোঁয়ার জাল। সেই জাল ছিঁড়ে কুটে ষোলো কলার চাঁদ ওঠে আকাশে। তরল রুপোর মতো জোছ্না শহরের মলিনতা ঢেকে একটা স্নিগ্ধ ভেজা ভাব আনে। সাত নম্বর বস্তির ছুতো-রের মেয়ে কালপেঁচি দুর্গাকে পট করে বিয়ে করে ফেলল নিবারণ। ছুতোরের একমাত্র সম্পত্তি পায়াভাঙা খাটিয়াটা দিল। ছেদির মা দুঃখের ধান্ধা করে একটা মাদুর দিল। সাতবাড়ি বাসন মেজে ফেলুর মা একটা আয়না দিয়েছিল। হত-কুচ্ছিৎ দুর্গা সেই আয়নায় গোল করে সিঁদুরের টিপ পরে কপালে।

—দুর্গা!

—কি?

—না, কিছু না।

—আঃ, গেল যা মরণ!

—তোর খুব কষ্ট হয় না রে?

—নাহ্।

—পেট ভরে খেতে পাস না।

—মেলা বোকো না তো!

নিবারণ আর মুখ খোলে না। দুর্গা কাটা ঠোঁট ছড়িয়ে মিটিমিটি হাসে। রুটিখানা ভাঁজ করে মাঝে এক ছিটে গুড় দিয়ে রাখে। টিফিনে গিলতে হবে তো।

॥ ৪ ॥

শহরটার পশ্চিম কোণে, পচা খালের গা ঘেঁষে হাড়কল। বদ গন্ধ ওঠে হাড়ের গুঁড়ো থেকে। হাড় কত কামে আসে! মানুষের হাড় বলে কথা! শিবুদাকে আগ-বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল নিবারণ : হ্যাঁগো ওখানে হাড় বেচা কেনা হয় নাকি? শিবুদা শহরটার নাড়ী নক্ষত্র জানে, তবু উদাসীনভাবে ঘাড় নেড়েছিল : কে জানে!

শিবুদার ভিমরতি ধরেছে। দিনে দিনে মানুষটা লোহা কাটা করাতের মতো হয়ে যাচ্ছে। চোখের জমি পিঙ্গলবর্ণ। কেবল ফিসফিস করছে : শুনেছিস?

—কি!

—আজ আবার সাতজন।

—সাতজন?

—হ্যাঁ।

—স্বচোক্ষে দেখলে?

নিবারণ শিবুদার শুবনো খটখটে চোখের দিকে তাকাল। চোখ দুটো বিলম স্থির। পরপর সাতজনকে দেখতে দেখতে চোখ দুটোর যেন পক্ষাঘাত হয়েছে। পিঙ্গলবর্ণ চোখের ডিম ফাটিয়ে অসম্ভব আশ্চর্য কালো মণি দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

—"সাত জনারই বয়েস বড্ড কম রে। চোখগুলো ভাসাভাসা। স্বপন দেখছিল যেন—।"

শিবুদা হাপরের মতো টেনে দম নিল। কারখানার বিষণ্ণ শেডের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে একটু একটু করে দম ছাড়ল।

—এতো রক্ত কোথায় যায়?

—কি জানি!

—নিবারণ!

—কি?

—তুই পালা। পোড়া শহরটা ছেড়ে পালা।

শিবুদা নিবারণের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করতে লাগল: পালা, পালা।

কোলকাতা শহরের বুকে ছেনাল রাত্তির হাজার ছলা কলা করে। দুর্গার হাতটা হাতের থাবার মধ্যে নিয়ে হাঁটছিল। দাঁতে দাঁত চেপে। দুর্গার এখন ভরা মাস। সে গজগচ্ছ ঢঙে চলে। আর কোম্পানির আমলের শহর সারি সারি দাঁতের মতো চিমনি বের করে হাসতে লাগল। ক্রমশ ফর্সা হচ্ছিল। নিবারণ দেখল ক্ষুদিরামের মূর্তির তলা দিয়ে কয়েকটি তরুণকে হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লাশগুলো হয়তো গঙ্গার জোয়ারে ফেলে দেবে।

—নাহ্।

—কি?

—যাব না, চল ফিরে যাই।

—ফিরবে?

—হুঁ।

—সেই ভালো। মনটা কেমনধারা পোড়াচ্ছিল। বাপভাই ছেড়ে আমি থাকতে পারি নে। ঘাসপাড়ার মানুসজনও বড়ো ভালো।

ভোর থাকতেই ফিরল। দুর্গা নিশ্চিন্তে চুলা ধরিয়ে, বাসি কাজ সারতে

বসল। আর নিবারণ রোজকার মতো চ্যান করে পেসন্ন বদনে কারখানায় গেল। শিবুদা ওকে দেখে মিচ্‌কে হাসি হাসল।

—গেলি না।

—নাহ্‌।

—কি করবি।

—লড়ব।

—লড়বি ?

—হ্যাঁ।

—লড় তাহলে।

—হ্যাঁ লড়ব।

হঠাৎ সমস্ত শহরটা দু টুকরো করে একসাথে অগলবগলের কারখানার ভেঁপু বেজে উঠল। গোঁ গোঁ একটা শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে অসুরের মতো শহরটার বুক কোপাতে লাগল।

খাসতা কাগজ

॥ ১ ॥

মাথার ছ্যাঁদলাধরা ভ্যাপসা ঘা খাঁচার শিকে ঘসে টিয়াপাখীটা ডানা ঝাপটাতে লাগল। হরবোলার ধূর্ত্ত লম্বা ধাঁচের মুখখানা বিরক্তিতে বেঁকে যায়: শালা খালি গিলতে চায়। চন্দনের ফোঁটা-কাটা কপালে আঁকিবুকি খেলল। খাঁচার গায়ে ঝাঁপড মারতে থাকে। খানিক আগেও সে সত্যি কথা বলার ঢঙে চেঁচিয়েছে: ভগবানের দুনিয়ায় অন্যায় করে কেউ পার পায় না। হরবোলা ধম্মের পাখী, ঠিক ন্যায় বলে দেবে। তা সে রাজা বাদশাই হোক, আর ফকির হোক। অমন যে মহারাজা নন্দকুমার তার বিচার পর্যন্ত এই আদালতে হয়েছে। হ্যাঁ ব্যাটা ন্যায়ের পুত্তুর, বল দেখি এ বাবুর মোকদ্দমায় হার হবে না জিত। চিল্লাতে চিল্লাতে সোওয়া হাত জিভ ঝুলে নেমেছিল।

—এই নাও বাবা পয়সা!

—বলুন?

—আমার ছেলেটাকে মেরে ফেললে গো—।

আদালত ভেঙ্গে গ্যাছে। খানিক আগেই একরাশ ওয়ারেন্টের কাগজ নিয়ে কোর্ট সেপাই ডান দিক পানে চলে গেল। লক আপের নীচে। শনের মতো ভুরু নেড়ে তেলেভাজার একফালি দোকান থেকে বটকেষ্ট হরবোলাকে ডাকল: কি ওস্তাদ! পাখীটাকে দানাপানি দ্যাও। রোজগার হয়ে গেল আর যত্ন আত্তিও শেষ।

—আর ভাল লাগে না।

—কি ?

—লোকঠকানো কারবার।

—কেন !

—আগে কোর্টে আসত কারা ?

—কারা আবার !

—ছিঁচকে চোর ঠগ চিটিংবাজ।

—আচ্ছা তাই হল।

—তাদের ঠকাতে মজাই লাগে, এই ছেলেগুলো তো কাউকে ঠকায় নি।

—কিন্তু তোমার মহারাজ নন্দকুমার ?

—ও একটা কথার কথা। অভ্যেস হয়ে গেছে বলি।

—ধান্ধা ছেড়ে দেবে ?

—দেখি। একটা পেট চলে যাবে।

ফ্যাকাসে গুলে মাছের মতো আঙুলে মস্ত বড কৌটোটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ল্যাংড়া ভিখিরি কর্কশভাবে চেঁচিয়ে উঠল : বটু দুটো আলুর চপ দে। দোকানের উইয়ে কাটা কাঠের পাল্লাটা একহাতে ধরল। ঝর ঝর করে কাঠের গুঁড়ো পড়ল। বটু গরম হাতাটা তুলে নিল : ভাগ শালা। কবে ব্যাটা ব্যারিষ্টার ছিল ছেঁড়া কোর্ট গায়ে চাপিয়ে এসে—বটু একটা···পয়সা ফ্যাল। এই বাজারে তো বেশ কামাচ্ছিস। বটু তোমার বাপ। শ্‌ শা লা।

থানার জিপটা কোর্টের তিমিমাছের মতো বিকট হা করা দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দশাসই সার্জেন্ট নেমে এল। বটুর পাশের দোকানে পানগুমটির আয়নায় চুলটা বাগে আনতে কোমর ভেঙে দাঁড়াল : সিগারেট। হাওয়াই সার্টটা বুকের মাংসের টানে খানিক ওপরে উঠল। কোমরে গোঁজা রিভলবার আর সামান্য ভুঁড়ি নজরে এল। হাতকড়া লাগানো ছেলেটা বেশ শক্ত হয়েই জিপে বসে আছে। ড্যাবড্যাবা চোখ দুটো ঘুরিয়ে দোকান পাট যেন জন্মের মতো

দেখে নিচ্ছে। গাড়ীটা ছাড়তেই হরবোলা বটুর দিকে চাইল : ছেলেটার মা আর দাদা হন্তে হয়ে আজ ঘুরে গ্যাছে। শালা এত বেগ্লায় চুপিচুপি পি. সি করিয়ে নিয়ে গেল। —আস্তে। আঃ।

হরবোলা চ্যাটাই, খড়ি, পুঁথি, পুঁটলীতে পুরল। খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে নিল : চলিরে। ততক্ষণে বটুও ঝাঁপ বন্ধ করতে শুরু করেছে। ল্যাংড়া ভিখিরিটা কেবল চিৎকার করছে : ধম্মের জয় সর্বত্র। আসুন দেখান, কাগজ দেখেই বলে দেবো। নাহলে এমনিই দশটা পয়সা দিন স্যার।

॥ ২ ॥

পেচ্ছাপখানার পাশে লম্বা আটচালা। কালো কুর্তা সাঁ সাঁ করে সরে যায়। সোজা হয়ে দাঁড়ালে মাথা দেয়ালে ঠেকে। হিজিবিজি ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে চামড়ার কভার দেওয়া নোটবুকে একশ টাকা বায়নার প্রেমনাথ উকীল কি যেন লিখছিল। কালো ভোমরার মতো মোটা ভুরু নেড়ে উকীলের আড্ডার আরেকজন মদ আর মেয়েমানুষের গপ্প করছিল। প্রেমনাথ উকীল কালো কোটের ভেতর থেকে বাঁধানো দাঁত দুপাটি বের করে খট্ করে লাগিয়ে নিল : শোন তাহলে, আজকের কথা নয়। বৃটিশ পিরিয়ডের কথা। স্বদেশী এক ছোকরার সাজা হয়ে যাওয়ার কথা। বাঘা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেটের আর্দ্দালী আমাকে বললে, সাহেব বাঙালী মেয়ে আর ধেনো মাল পেলেই জিব দিয়ে লালা গড়াবে······।

—দিলেন যোগাড় করে!

—আর সেকথা থাক।

ততক্ষণে টাইম হয়ে গ্যাছে। হরবোলা বাবার কর্কশ গলা আরো চড়েছে : মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হল। স্বর্গ মর্ত্য নেই, অন্যায় করলে হাতে নাতে ফল। ল্যাংড়া এডভোকেট ভিখিরি ওত্ পেতে বসে আছে। পিচুটি ভরা চোখে চড়কি নাচে : কাগজে একবার চোখ বুলিয়েই বলে দেব কেস টিকঁবে কিনা। এই কোর্টে বিশ বছর প্যাকটিস করেছি। আচ্ছা না হয় এমনিই······।

দাতুসার্টের ঝুল হাঁটু অব্দি নেমেছে। আধ ময়লা ন্যাতার মতো কাপড়ে ঢাকা লিকলিকে পা। পায়ের মরা গুলী বেয়ে চ্যাটানো পাতা অব্দি কিলবিল শিরা। শেকর বাকরের মতো ছড়ানো লম্বা লম্বা আঙুল। বহুকালের ছ্যাতলা জমা নোখ আর লোম। ন্যাতার মতো কাপড় ভেদ করে সব নজরে আসে। ওপর দিকে কিচ্ছু ঠাহর করার উপায় নেই। মাজ্জার হাড্ডি থেকে ওপরটা গিলে খেয়েছে। উর্দ্ধাঙ্গ খেয়েখুয়ে সাফ করে দিয়েছে। লোকটা শব্দ করে সিঁড়ি ভাঙে আর ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ে। মুখের ভাপ লেগে কাগজের টিঁপির আধ খাওয়া কোনা ওড়ে পত্ পত্ করে: হঠ্ যাও, হঠ্ যাও।

'শালার মগজ নেই'—প্যাংলা খাঁচের একজন ফিনফিনে নাক নেড়ে বিরক্তিতে মোটা ঠোঁট ঝুলিয়ে দেয়। ছিনতাই কেসের আসরাফ হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠল: মগজে কাগজ ঠাসা। খাস্তা কাগজ। আবগারী কেসের এক আসামী গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল। কোর্ট সেপাই মোটা থ্যাবড়া নাকে ধমক লাগাল: এ রসুল হাকিম আতা হ্যায়। আবগারী কেসের রসুল গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল: আউর ইধার গলা কাটা আতা হ্যায়।

মেটে রঙা দেয়াল ঘেঁষে চওড়া পুরোনো কাঠের সিঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে উঠেছে। আধো অন্ধকার। দোতলায় তিন চারটে খোপ। হাকিম বসে। খোপের সামনে চেরা জিভের মতো লাল পর্দা দুখানা লক লক করে। পর্দাটার দিকে হাজায় খাওয়া আঙুল মেলে ধরে সৌদামিনী: হ্যাঁ বাবা এইখেনে বিচার হয়? মস্ত বড় টিউমার সমেত গালটা কাত করে মানুষটা বলল: হ্যাঁ। সিঁড়ির শেষে কাঠের পাটাতনে হাজিরার বত্রিশ ভাঁজ মানুষ। হাজিরার লোকজন, পুলিশের কুনুইর খোঁচা, বন্দুকের কুঁদো, সি. আর. পি.'র বুটজুতো আর কোর্ট সেপাইর হাঁপের টানের মতো ডাক: হাকিম আতা হ্যায় সব চুপ হো যাও।

—হ্যাঁরে মানকে, নিতেকে তো আনলে না?

—নিতেকে আনবে না।

—ম্যাজিস্টার বিচার করবে নি!

—দেখলে না কাগজ নিয়ে উঠল একরাশ।

মানকের মুখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়। সৌদামিনীর ফুলতোলা পাড় মাথা থেকে খসে গেল। কাঁচা পাকা চুলের মাঝখানে এক খাবলা সিঁদুর। মানকের মুখের দিকে চেয়ে সৌদামিনী কিছু ঠাহর করতে না পেরে মুখটা হা করে রইল। সুতোর মত একটা লালার রেখা ঠোঁটদুটো জুড়েই ফট্ করে ফেটে গ্যালো।

—গলাকাটা আতা হ্যায়!

আবগারীর কেস খাওয়া রসুল গলার শিরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হাসতে লাগল। পানের পিক দেয়ালে ছিটিয়ে মহুরীর দল এক এক লাফে তিন তিনটে সিঁড়ি টপকে উঠছিল। পেছন পেছন এক রাশ কাগজ উঠে আসছে। ঢাঁউশ কাগজ। কে যে বয়ে আনছে দেখার যো নেই। খ্যাংড়াকাটি পা দুটো খালি দেখা যাচ্ছিল। বড় বড় নোখ এঁকে বেঁকে মাটি খাবলে ধরছে। সৌদামিনী মানকের জামার খুঁট ধরে টানল: মানুষ নাকি!

একদৃষ্টে কাগজের টিঁপি আর দড়ি পাকানো পা দুটো দেখতে দেখতে সৌদামিনীর মাছের পটকার মতো চোখ ফেটে যাচ্ছিল। ভিড়ের ভেতর থেকে চিকন গলায় কে যেন বলল: শালা দম আটকে মরবে!

একটা বোঁটকা গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে, কাগজের টিঁপি নিয়ে সেপাই হাকিমের ঘরে লাল টকটকা পর্দা সরিয়ে ঢুকে গেল। যাওয়ার সময় চালের কেসের ন বছ-রের ডালিমকে লিকলিকে চ্যাটানো পায়ের পাতা দিয়ে লাথি মারল: হঠ্ কুত্তীর বাচ্ছা। মেয়েটা ফোঁস করে ঘাড় বেঁকাল। আবার হাঁক শোনা গেল থ্যাবড়া নাকের: হাকিম আতা……।

সৌদামিনীর নিকেলের চশমাটা পড়ে গেল। চশমা ছাড়া সে অন্ধ। খুনের আসামী ওসমানের কানের গোড়ায় মুখ নিয়ে এক উকিল ফ্যাসফেসে কাটাকাটা গলায় বিড়বিড় করছিল: বেল যখন হয়েছে কেস চুকিয়ে দেবে। হাকিম পুলিশকে মালটাল খাওয়ানোর জন্য দু তিনশ ছাড়। খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল।

—মাণিক!

—কি হল?

—আমার চশমা?

—ওক্‌।

সিঁড়ির থ্যাবড়া মাথায় থুতনি রাখতেই সৌদামিনীর চোখ ফেটে জল গড়াতে লাগল। হরবোলা সৌদামিনীর মুখটা খুঁটিয়ে দেখছিল।

—এই আরেকজন।

—এর কথাই বলছিলুম। সেই যে সেদিন পি. সি. নিয়ে গেলনা।

—আহা!

—এতক্ষণে বোধহয় গুলি করে দিয়েছে।

—নকশাল?

—হুঁ।

•

হরবোলার লম্বা নাকটা ঠোঁট ছুঁয়েছে। এক গেলাস চায়ের আদ্দেক খেয়ে বটুর দিকে গেলাসটা আগিয়ে দিল—উঁ, নে। বিড়িটা ধরাল হাওয়া বাঁচিয়ে। ধোঁয়া ছাড়তে লাগল রয়ে সয়ে—এ ধান্ধা মাইরী ছেড়ে দেব। বটুর গলাটাও ধরে আসে: দিনরাত্তির এই দেখতে দেখতে আর ভাল লাগে না। শালা মেজাজ এমন চড়ে যায় কি বলব।

এ্যাডভোকেট ল্যাংড়া ভিখিরী সামনের হনুমানজীর মন্দিরের গায়ের বটগাছ-টায় হেলান দিয়ে চ্যাচাচ্ছিল: হাকিম শালা ভেরুয়া এ্যায়সা……। পুলিশের কথায় যোতে।

বটু হরবোলার খাঁচাটা হাতে নিয়ে পাখীটার পচন ধরা ঘা দেখতে দেখতে বিড়বিড় করল: এ্যাডভোকেট আজ মাল টেনেছে।

॥ ৩ ॥

পুরোন মান্ধাতার আমলের কাঠের পাল্লা হা হয়ে আছে। পাল্লার দুপাশে স্তম্ভের মাথায় ইংরেজ আমলের রাক্ষুসে সিংহ দুটো। কাক চিল শকুনে মরা হাড় আর নোংরা রক্ত কানি এনে ফেলেছে সিংহের পায়ের কাছে। ধুমসো ভ্যানগাড়ী

গুলো কোর্টের পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায় পাল্লা ঠেলে। পাল্লা দুটো থ্যাবড়া ঠোঁটের মতো নড়ে ওঠে। ঢেকুর তোলার মতো একটা শব্দ হয়। আর হঠাৎ মোগানে মোগানে আদ্দিকালের বাড়ী থেকে চুন বালি খসে। আনাচে কানাচে চামচিকের পাখার শব্দ হয়।

গাড়ীটা ঢুকতেই তালকানার মতো সৌদামিনী ছুটতে লাগল। বুকের পাজরা ঠেলে একটা ব্যথা উথলে ওঠে—নিতে রে, বাবা নিতে।

কোরটের বাঁ হাতি লম্বা একটা ফালি চলে গেছে। পেচ্ছাপের কূট গন্ধ আর পুলিশের নাড়ী পচা খিস্তিতে ঠাসা। লক আপ। গালে হাত দিয়ে ঐখানে সৌদামিনী নিজেকে খুঁজবে।

—বড় ছেলেটা আর আসে না।

—ভাইয়ের দরদ আর কতদিন।

—কে জানে তাকেও হাপিস করেছে নাকি।

—হতে পারে।

—সেই পি. সি. নিয়ে যাওয়ার পর তুইও তো আর দেখিস নি।

—নাহ্।

—এরা চেয়েছিল স্বর্গ টেনে আনতে।

—না। স্বর্গ বানাতে।

—ছেলেগুলো বেশ না!

—রাম বোকা।

হরবোলা এবার চটটা পরিপাটি করে বিছিয়ে নিল। খড়ি, পুঁথি সাজিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল। বটু চায়ের গেলাশে চামচে নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করল: মেয়েমানুষটা পাগলা হয়ে যাবে।

কাঠের সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে উঠতে সৌদামিনীর হাঁটুর খিল ভেঙ্গে আসে। রক্তের মতো লাল পর্দ্দা সরিয়ে হাকিমের ঘরে ঢুকতে গেল সৌদামিনী।—'যেখান থেকে হোক ছেলেকে এনে দিতে হবে' আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে পর্দ্দাটা

সরাতে গিয়ে মাথায় জড়িয়ে গ্যালো। রক্তের মত পর্দাটা চোখের মণিতে লাল ছোপ ছিটিয়ে দিলে, সৌদামিনী আঁৎকে উঠল—উঃ। মোটা থ্যাবড়া নাক কোর্ট সেপাই ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দিচ্ছিল: হঠ্ যাও। সৌদামিনীর চোখ ঠিকরে আসতে লাগল: আমার ছেলে নিতেকে কোথায় রেখেছিস? টাকমাথা ইনস্‌পেকটার হাকিমের কানে ফিসফিস করতে লাগল। হাকিমের চুলের টেরিটা কেবল নজরে আসে। পেনসিল আর কাগজের খসখস শব্দ।

সেই লোকটা আবার কাগজের ঢিঁপি নিয়ে উঠছিল। কিছুতেই লোকটার মুখ দেখার যো নেই। ফোঁস ফোঁস করে নামতে লাগল। চ্যাপ্টা পেছন দেখা গেল। বকের মতো সরু ঘাড। ঘাড়ের পাশে মোটা নীল শিরা।

॥ ৪ ॥

সিঁড়িব ফাঁক ফোকরে অন্ধকার। দিনদুপুরে বাতি জ্বলে। তবু অন্ধকার যায় না। আধো অন্ধকারে হাঁটু চেপে মানুষজন বসে আছে। বিড়ির ধোঁয়া পাক খায়। পর্দাটা কাঁধ দিয়ে সরিয়ে ঢাউশ কাগজ নিয়ে লোকটা হাকিমের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঢিঁপিটা কাঁপছে। মানুষটার মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে ঢিঁপিটা। রক্তে চোবানো নাড়ীর মতো একটা লাল ফিতে দিয়ে বাণ্ডিলটা বাঁধা। লোকটা কুঁতে কুঁতে হাঁটছিল।

—নিতে কোথায়?

—কোন শালা?

—নিতের ওয়ারেন্ট কাগজ ছাখা।

—হঠ্, দেবো এক ধাক্কা।

—খুন করেছিস তাকে না?

—আচ্ছা ঠ্যালা।

—খুন করে বিচার!

—ভাগ শালী।

—রক্তে চোবানো নাড়ী কোথায় পেলি ?

—চোখের মাথা খেয়েছিস।

—নিজের নাড়ী কেটে এনেছিস, খুন করেছিস তাকে না !

সৌদামিনীর মাছের পটকার মতো চোখ দুটোর দিকে অবাকভাবে তাকিয়ে রইল হাজিরার লোকজন। গলার টিউমার নেড়ে সেই আধাবয়েসী লোকটা বলল : ওর ছেলেকে বোধ হয়—। কথাটার বাকী আধখানা গাঁক করে গিলে ফেলল। ভারী একটা গলা শোনা গেল : এরকম গুলী তো আকছারই হচ্ছে।

কাগজের পাহাড় নিয়ে লোকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গ্যালো। সৌদামিনী ঢাঁউশ কাগজের মধ্যে ঝাঁপ দিল। দুহাতে ফালা ফালা করে কাগজ ফাঁড়তে লাগল : কেসের নিকুচি, হাকিমের নিকুচি। কাঁচা পাকা একরাশ চুল কাঁধ বেয়ে বুকের দুপাশে ছড়িয়ে গ্যাছে। চোখ দুটো যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে। ছত্রাকার কাগজের মধ্যে লোকটার বুরবাক মুখ জেগে রইল : ভুরু দাড়ি গোঁফ চুল কিচ্ছু নেই। মাকুন্দে। জিভটা নাকে ঠেকিয়ে ঠকঠকিয়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ মাকুন্দে মুখ নেড়ে খ্যাক খ্যাক করে চ্যাচাতে লাগল। সরকারী কাগজ কা উপর হামলা কর দিয়া—। দুদ্দার পুলিশ ফৌজ হাঁপাতে হাঁপাতে আসতে লাগল। সৌদামিনীকে পিছমোড়া করে বাঁধা হল।

॥ ৫ ॥

তারপর থেকে কাগজের ঢিঁপিটা একপাশে হেলে থাকে। ঢাঁউশ ক্ষয়াক্ষয়া কাগজের একপাশ থেকে খোঁচার মতো একটা কাঁধ উঁচিয়ে আছে। পা টেনে টেনে চলে লোকটা। আর বিড়বিড় করে : সব শালাকে খাঁচায় পুরবো। ওসমানের খুনের কেস মিটে গ্যাছে। এখন একটা রেপকেস ঝুলছে।

ওসমান পিরীত করে ফাঁকা কাঁধটায় হাত রাখে : ওস্তাদ ঠ্যাঙের দুঃখু ভুলে লাও সিগারেট খাও।

হরবোলাকে বটু সাদা ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল : তাহলে নিজের মাকে পাগলী বানিয়ে চালান দিল।

—শালার ঠ্যাংটা জন্মের মতো গ্যাছে।

'শোন তাহলে'—বটু ঢোঁক গিলে রাজরাজরার এক গল্প ফেঁদে বসে।

তেরো

কচি তালশাঁসের মতো মেয়েটার হৃৎপিণ্ডে কে যেন আমূল একটা ছুরি চর্ চম্ করে ঢুকিয়ে দিল।

হিক্কার পর হিক্কা তুলে শরীরটা কাহিল হয়ে গ্যাছে। এখন আর সাড়া নেই। তিন বছরের মেয়েটার যে ঘরের টান এ্যাতো পূর্ণিমা ভাবতেও পারে নি। শ্যালকুত্তারও একটা আচ্ছাদন দরকার। আর পূর্ণিমার মাথার ওপর এখন ভাদ্রের আকাশ। অথচ কি আহ্লাদেই না বাসা বেঁধেছিল। মেয়েটার কাঠির মতো আঙুল লক্ষ্মীর সরাখানাকে শক্ত ধরে রেখেছে। ভাঙা চৌকিটা টেনে বের করতেই মেয়েটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। তারপর একে একে যখন ছেঁড়া মাদুর ন্যাকড়ার পুঁটলি···আর অজিতের ডিউটির জুতো বের করে শিকলি তুলে দিল··· পূর্ণিমার মেয়েটার হৃৎপিণ্ড ফালা ফালা করে তীক্ষ্ণ কান্নার খুন ফিন্‌কি দিয়ে ছুটল।

পূর্ণিমার অঢেল চুল অন্ধকারে মিশে গ্যাছে। রুক্ষ্ম চুলে গিঁট দিয়ে দিয়ে পূর্ণিমা দুঃখের হিসেব গেঁথেছিল। এখন সব জট পাকিয়ে একসা। অজিত এলে আর বলতে পারবে না: তুমি ছিলেনা এই ন্যাকো······। এখন মানুষটা তো ফিরুক। টুটা ফাটা পট্টি লাগানো জুতো জোড়ার দিকে চাইতেই পূর্ণিমার বুকের ভেতর পুলিশ ভ্যানের হারামী শব্দটা হামলাতে থাকে। অথচ

এই সেদিন···ভোর রাত্তিরে···অজিত জুতো জোড়া পায়ে গলিয়ে, আঁট করে ফিতেটা বাঁধতে বাঁধতে, চোয়াল চেপে বলছিল : চারদিক দেখছো তো······ আমার কিছু হলে সংসারটাকে তোমার দেখতে হবে। পূর্ণিমার সেই সংসার এখন ফুটো মেটে হাঁড়ির পাতিল, মেয়েটার ঝিনুক, কানা ভাঙা কাঁসার একখানা থাল, ফর্দাফাই মাদুর আর কোজাগরী লক্ষীর পট নিয়ে আগুনের চাটুর মতো আকাশটার তলায় ভাজা ভাজা হচ্ছে।

মেয়েটা কিসের এক বেয়াড়া টানে সরাটা আগলে রেখেছে। টানাহ্যাঁচড়ায় চটলা উঠে গ্যাছে। এই সরাখান্না নিয়ে কত কাণ্ডই না হয়েছে। মানুষটা ঠাকুর দেবতা মানে না। আর পূর্ণিমার বুক কবুতরের পেটের মতো কাঁপত : ওকথা বলো না! সব্বোনাশ! পূর্ণিমার চোখের ডিম আতঙ্কে ফাল দিয়ে উঠত কপালে। আর অজিতের ভরাট মুখখানায় কেমন একটা সোহাগের হাসি ছুট লাগাত তরতরিয়ে। পূর্ণিমাকে ভয় পাইয়ে অজিত কেমন মজা পেত। চাউল পট্টি রোডের খোলার চালার নিচে বসে মানুষটা থেকে থেকেই সব্বোনাশের পা আঁকত : বুটের লাথ দিয়ে আগে তোমার সরাখানা ভাঙবে। পূর্ণিমা ফোঁস করে উঠেছিল : ইস্ বল্লেই হল······ঘরে আঁশবঁটি নেই! দেখুক না ঘরে পা দিয়ে।

চাউল পট্টি রোডের শিরদাঁড়ার ওপর ম্যাচ ফ্যাকটারী। পাতলা কাঠ ছালের আনকোরা নতুন গন্ধ আর ম্যাচ ফ্যাকটারীর বারুদের ঝাঁজ ঠেলে ওরা খালপারের বস্তির জটলার ভেতর পরম ভরসায় ঢুকে পড়েছিল। প্রথম মাসের মাইনে হাতে পড়তেই অজিতের আর তর সয়নি। খালপারের বস্তিতে চামড়ার পট্টি আর রুটি কারখানার চিমনির ফাঁসের ভেতর ডেরা বাঁধল ফুলকো গরম রুটির মতো স্বপ্ন নিয়ে। লোনা ধরা দেয়াল থেকে টিকটিকির ল্যাজের ঘষায় চুনবালি খসে পড়লে অজিত রহস্যি করে বলত : ফুলশয্যে কিনা তাই পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলে খালপারের ডেরায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল ঝরলে, গেলাশ

ফ্যাকটারীর ওয়ারকার পূর্ণিমাকে বুকে ধরে রাখত: দেখি শালার ঝাঁট কেমন ছোঁয়।

অযত্ন অচ্ছেদায় পূর্ণিমার পেঁজা তুলোর মতো চুলের রাশের ভেতর লিকির আস্তানা গজিয়েছে। ঘিলু অব্দি খুবলে খায়। অথচ পূর্ণিমার হুঁস বসতে নেই। কি হবে ছাই চুল দিয়ে। যার জন্যে সব সেই মানুষটাই যখন নেই। বুকের ভেতরটা কি যে পুড়ে খাক হয়। নিজের শরীরটা, পেটটা, সব এখন বোঝার মতো লাগে। কচি মেয়েটাকে নিয়ে সে এখন কোন চুলোয় যাবে! ছাঁ্যাদলা পরা উঠোনের ভাঙা ইটের খাঁজে কলসীটা আছড়ে ভেঙেছিল। পানির একটা শীতল ছোঁয়ায় গোড়ালিটা এখনও ঠাণ্ডা। বাসা পাল্টালে নাকি কলসী নিতে নেই। পূর্ণিমা বাসা পাল্টায় নি। এক নির্মম দমকা বাতাসে মাথার ওপর থেকে আচ্ছাদনটুকু সরে গ্যাছে। গেল তিন মাস ধরে যুঝে, নানান ফন্দি ফিকির করেও রুখতে পারল না। ঠোঙা বানিয়ে, ফোরনে রবারের সুতো ছাড়িয়ে, কিছুতেই ডেরাটা বজায় রাখা গ্যালো না। মানুষটা ফিরলে কি দিয়ে যে বুঝ দেবে। আবার মনে হয় মানুষটার হাত পা নিয়ে ফেরাটাই আসল কথা। বুঝ কিসের!

মেয়েটাকে শানের ওপর আলগোছে শুইয়ে ছড়ানো সংসারটা পুটলিতে বেঁধে ফেলল পূর্ণিমা। অজিতের ডিউটির জুতো জোড়া দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে নিল। কপাল চাপড়ানোর টাইমও নেই। ডেরা একটা জোগাড় করতেই হবে। কোনো মতে জল ঝড় থেকে মাথাটা বাঁচানো। না হলে মাসে একবার বিড়ি, চা আর গুড় জুটবে কোথেকে? আর কেউ যদি চোখের দেখাটাও না দেখে সেই বা যুঝবে কেমন করে? পূর্ণিমা কি ঢিলে দিতে পারে—যেমনি করে হোক দুদিক সামলে চলতে হবে। এমনি হাজার কথার জোবে পুঁটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটার রুগ্ণ জির জিরে শরীরটা বুকের সাথে মিশে গ্যাছে।

মাথার ওপর আগুনের ভাটার মতো ভাদ্রের আকাশটা নিয়ে, মাথা গোঁজার

একটা ডেরার খোঁজে পূর্ণিমা একরোখা ঘাড়টা কাত করে পাখীর ডানার মতো ঝাপট মেরে চলল।

মানদা দরজার পাল্লা টেনে শিকলি তুলে দিচ্ছিল। এমন সময় এক হাতে পোঁটলা আর দুবলা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে পূর্ণিমা এল। মানদার আর তিনকূলে কেউ নেই। একটা মানুষ গতর খাটিয়ে খায়। ভাগে যোগে যদি মানদার সাথে থাকা যায়। ততক্ষণে মানদা শিকলি খুলে পূর্ণিমাকে সাপ্‌টে টেনে নিয়েছে ঘরের ভেতর: আর বলতে হবে না লো। এমন ভারী সময় কি একা কাটানো যায়? আর আমি কি তোর পর নাকি? নাকি তার নিজের পেটটা বড় হয়েছিল বলে লড়তে গেছিল? আমার সুকুমার বেঁচে বত্‌তে থাকলে তোর মতো একটা বৌ আসতো না ঘরে?…এই তো সেদিন সব বলছিল……দে…সে ··মেয়েটার মুখখানা একেবারে আমসি…।

মানদার বুক থেকে স্নেহ ভালবাসা দুধের মতো উথলে উঠছিল: যদ্দিন না ফেরে এই লড়াই তোকে চালিয়ে যেতে হবে…………একলাটি কি পারা যায়…।

মানদার তিন হাত বাই তিন হাত ঘরখানায় পূর্ণিমা ফের সংসার পেতে বসল। কোজাগরী লক্ষ্মীর সরা দেয়ালে টাঙিয়ে দিল। আর রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে সুখদুঃখের দশটা কথা বলে, দুটো জীবনের অচ্ছেদ্য আর ভরসার কথা বলতে বলতে একসময় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল সকাল নেয়ে নেয় পূর্ণিমা। লাইনের কল। মানুষগুলো সাত সন্ধ্যায় ছোটে। তর সয় না কারো। জলদি জলদি চ্যান করে, তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে, পূর্ণিমা ধোঁয়ায় ভাসে। চাল ডালে চাট্টি ফোটাতে ফোটাতে কত কথা মনে আসে। যে রাতে ছেঁকে তুলে নিয়ে গ্যালো, সেই রাত্তিরটাই বেশী করে মনে পড়ে। পূর্ণিমার শিয়রের বালিশটা ছিঁড়ে ফর্দাফাই করল। ওর ভেতর নাকি অস্তর আছে। শেষে একটা মানুষকে দশজন মিলে হাতকড়া

শরিয়ে হ্যাচ্ড়ে নিয়ে ভল্লুকের পেটের মতো ভ্যানে টেনে তুলল। সেই থেকে রাত্তিরটা পূর্ণিমা ভুলতে পারে না। দপ্ দপ করে মানুষটার শক্ত চোয়াল ভেসে ওঠে। রাত হলে বোলতার হুল ফোটাতে এখনো সারাটা পাড়ার বুকে পুলিশ ভ্যান দাপিয়ে বেড়ায়। আর পূর্ণিমার চোখের ডিম লাফায়, কে জানে কার ঘরে সব্বোনাশ হাত পা বিছিয়ে এল। মানদা বলে: দিনের বেলা তবু একরকম……কেবল পেটের চিন্তা…আর রাতের বেলা পুলিশের দাপট…দিনের বেলা পেট সামাল—রাতের বেলা জান সামাল…।

আজ মোলাকাতের তারিখ। মানুষটার দেখা পাবে এক পলকের জন্য। সারা মাসে ঐ একটি বার। পরনের কাপড়খানা খার কাচা করেছে। এখন ভাল করে শুকোয় নি। মানুষটার যাতে দুশ্চিন্তা না হয় সেজন্য একটু সাফ সুতরো হয়ে যায়। গোল করে পূর্ণিমা কপালে টিপ দিল। আবাগী মেয়েটা হঠাৎ ঘুম ভেঙে খ্যানখেনে গলায় কেঁদে উঠল। পাশের খোপ থেকে নিতের মার গলা শোনা যাচ্ছে। দজ্জাল মেয়েটাকে শাসন করছে নিতের মা: ছ্যাখ, দেখে শেখ। ভাতারের জন্য বৌটা থানাপুলিশ সাতঘাটের জল খেয়ে মচ্ছে……।

—অমন ভাতার হলে মাথায় করে রাখতুম!

বুঁচি সমানে জবাব দিচ্ছিল। ওর বর মদ টেনে এসে নিদ্দুম ঠেঙাত। বুঁচি কাটারি ছুড়ে মেরেছিল সহ্যি করতে না পেরে। নিতের মার আসলে গলায় বেজে আছে বলে বিদেয় করার ফিকির খোঁজে। বুঁচিই এই সেদিন মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বলেছিল: বুঝলে দিদি, ঘর বাঁধলেই কি হল, ঘরের মানুষ বেচাল হলে অমন ঘর থাকা না থাকা সমান। পূর্ণিমার বুকটা খা খা করে উঠেছিল। পূর্ণিমা হেঁটে গেলে মানুষটা ব্যথা পেত। এই বুঝি পূর্ণিমার ফোস্কা পড়ল। বুঁচির গলা শুনে কেমন একটা গর্ব হল। সত্যি মানুষটা তার হেদি পেঁজি নয়। মহল্লার এক নম্বর পুরুষ। কে যেন বলে কথাটা—রাধুদা। কালই তো এসেছিল। খোঁচা দাড়ি আর লাগাম ছেঁড়া হাসি।

—এবার একটু চিনি পাওয়া গ্যাছে, অকলেশ্বর মুলুক গ্যালো, ওর কাবুড়ে··· ।

—খুব খুশী হবে !

—আর বোলো সবাই হাতের মুঠো চিবিয়ে খায়নি।

মোলাকাতের আগের দিন রাধুদা বরাবর আসে। দু বাণ্ডিল বিড়ি, আর অন্তরের একটা টান নিয়ে। একথায় সেকথায় সময়টা তখন হু হু করে কেটে যায়। কার ছেলেকে জেলের ভেতর খুন করেছে······কোথায় নাকি মানুষজন হাড়গোড় জুড়ে এককাট্টার (রাধুদা বলে—একাই) অস্তর বানাচ্ছে······। পূর্ণিমার তখন কেমন শরীরটা শক্ত হয়ে ওঠে। কেমন করে গুটি গুটি ও খালপারের ঘরে গিয়ে ওঠে। ডিউটি থেকে ফিরে, খেতে বসে হঠাৎ অজিত অমনি বলত : বুঝলে তোমাদের সেই কর্নফুলি গাঁয়ে······এক বিরাট জলুস হয়েছে···জোতদারদের গোলা থেকে তামাম চাল টেনে······। পূর্ণিমা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকত। হঠাৎ খুশীতে পেত। চালদখলের খুশী। অজিতকে খুশী করার খুশী। আর ছোটবেলার চ্যানের ঘাট নিয়ে কর্নফুলি গাঁ হঠাৎ যেন গেলাশ ফ্যাকটারীর চিমনির ধোঁয়ায় আব্ছা আব্ছা জেগে উঠত।

বিড়ির বাণ্ডিল আঁচলে বেঁধে পূর্ণিমা মেয়েটাকে কাঁখে নিয়ে উঠোনে নামল। ঐ দু-এক বাণ্ডিল বিড়ি ছাড়া কুটোগাছাও নিতে পারে নি। অজিত হেসে বলেছিল—কমুন করে আছি তো···অত ভাবতে হবে না। ফিরে এসে পূর্ণিমা রাধুদার দিকে চোখ দুটো গোল্লা গোল্লা করে তাকিয়েছিল : কমুন কি ? রাধুদাও জানতো না। তারপর আপনা আপনি পূর্ণিমা টের পেয়ে গ্যাছে। এই যেমন মানদার সাথে পূর্ণিমা সুখদুঃখ ভাগ-বাঁটরা করে আছে, তেমনি।

ভাটপাড়া পুল অব্দি আসতে পূর্ণিমার বাটা জোড়া মুখ চুবসে যায়। মানুষটা যখন ঘরে নেই ছিরি দিয়ে কি করবে! বছর পুরতে চলল মানুষটা জেলে পচছে। অজিত এলে পূর্ণিমা তাকে কোথায় বসাবে ? চাউল পট্টি

রোডের ঘুপচিতে এ্যাম্বিনে নতুন লোক এসে গ্যাছে। রোদের কামড় এড়াতে পূর্ণিমা মেয়েটার মাথায় আঁচল চাপা দিল।

ভাটপাড়া পুল পেরিয়ে রাস্তাটা বাঁ হাতি ঢালু হয়ে নেমেছে। প্রেসিডেন্সী জেলের গা ঘেঁষে। পাঁচিলটা কি এক স্পর্ধায় ফাল দিয়ে আকাশটাকে ছুঁতে চাচ্ছে। রোজই একটু একটু করে উঁচু হচ্ছে। তারকাঁটার বেড়া, সেপাই কোয়ার্টার, আর বেয়নটের লম্বা ছায়া মাড়িয়ে কচি মেয়েটা এখন পূর্ণিমার হাত ধরে হাঁটছে। জেল গেটের সামনে সরু রাস্তার ওপর মানুষের একটা ভাঙা ভিড়। কেউ কেউ তারকাঁটার বেড়ায় শীর্ণ আঙুল চেপে থুতনিতে হাত বোলাচ্ছে। খসখসে শুকনো মুখে মরা ঘাসের ওপর হাঁটু ভেঙে এক বিধবা বসে আছে : সুবলা আমার চানাচুর ভালোবাসে। কথাটা শুনে কে যেন মরিয়া হয়ে মৃদু হাসল।

পূর্ণিমা দুচোখের পাতা চিরে পাঁচিলটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। ভ্যান নিয়ে, জিপ নিয়ে হাওয়াই শার্টের ভেতর রিভলবার লুকিয়ে আসা যাওয়ার শেষ নেই। পূর্ণিমা আর বসে থাকতে পারে না। কখন যে পিলিপ ডাকবে তার তো কোন মা বাপ নেই।

: আমার ছেলেটা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গ্যাছে !

: আচ্ছা ওরা কি রক্ত টেনে নেয় ?

: বৃটিশ পিরিয়ডেও এ্যামন দেখিনি !

কথাগুলো সব কানে বাজছে। অথচ পূর্ণিমা একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। সিপাই সান্ত্রী লোকজন দেখতে দেখতে মেয়েটার চোখে ঢল নামছে। চিৎকার, রাইফেল, বেয়নেট, কালোগাড়ীর শব্দ আর খিস্তির মধ্যেও মেয়েটার চোখে ঘুমের ঢল। আর পূর্ণিমা মনে মনে কথা সাজাচ্ছিল। বলবে— ভেবোনা আমি ভালোই আছি। ঘরখানা ছেড়ে দিলুম। তুমি নেই শুধু শুধু ভাড়া গুণে মরবো কেন। মানদা মাসীর কাছে আছি। তুমি এলে পরে ফের ঘর নেবো…। এত সব ভাবনার মধ্যে মোলাকাতের নামডাকা শুরু হয়ে গ্যাছে। ঢ্যাঙা এক সিপাই চোখ পিট পিট করে নাম ডাকছিল। অজিত কয়ালের নামটা ডাকতেই পূর্ণিমা ঘুমন্ত মেয়েটাকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল। সাথে

সাথে মেয়েটার ঘুম চটে গ্যালো। পূর্ণিমা খাঁচার দিকে ছুটছিল। ডানদিক পানে বালির রাস্তার ওপর সি, আর, পি'র বন্দুকের হিম ঠাণ্ডা নল—কচি মেয়েটা সেদিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকল।

খাঁচার ওপাশ থেকে একমুখ দাড়ি আর ফোলা ফোলা মুখ নিয়ে অজিত এগিয়ে আসছে। গায়ের রঙ ম্যাতা হয়ে গ্যাছে। খোস প্যাচড়া চুলকানিতে ভ্যাপসা অজিতের একটা হাত তারের জালটাকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করল। আর ঠিক তখনই কানের পর্দা ফাটিয়ে সিটি বেজে উঠল গাঁ, গাঁ করে। খাঁচার ভেতর মানুষটার মাথা থেকে রক্ত ফিনকি দিল। সিপাইরা ডাণ্ডা নিয়ে ছুটছে। পাঁচ হাতিয়া। অজিতের জামাটা ঝাণ্ডার মতো লাল…। পূর্ণিমা ভিরমি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছিল। মোলাকাতী জনতা সামলে নিল। সেপাই সান্ত্রীর চোখের মণিতে ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদ উঠছে: পাগলী! পাগলী! জেলার আশমান তাক করে তিনবার ফায়ার করল। ভিড়ের ভেতর থেকে কোড়ে গোছের কে যেন বলল: পালাতে চেষ্টা করছিল। আরেকজন খেঁকিয়ে উঠল: ঠাণ্ডা মাথায় খুন করছে!

যারা মোলাকাত করতে এসেছিল খেদিয়ে খেদিয়ে তাদের গেটের বাইরে নিয়ে এসেছে। একটা বাচ্চার হাত ভেঙে গ্যাছে, তার কান্না চিৎকারে মিশে গ্যালো। পূর্ণিমার মেয়েটা এতক্ষণ দম ধরে ছিল। হঠাৎ কান্‌তে লাগল। ধাক্কা খেতে খেতে মানুষগুলো সব এক জায়গায় শক্ত হয়ে ডেলা পাকিয়ে গ্যাছে। এক বিধবা ছুঁচের মতো গলায় গেটটা চেপে কি যেন চিৎকার করে বলল। গেট পেরিয়ে হঠাৎ বিশু নামের ছেলেটার মা ছুটতে গ্যালো। গোলগাল, ভরাভরা একজন ঝাপ্‌টে ধরল: উতলা হবেন না। কথাটা শুনেই পূর্ণিমা দপ্‌ করে জ্বলে উঠল: উতলা হবে না মানে! উতলা হবেনা মানে কি!

রাত গড়িয়ে ফিরল।

চাউল পট্টি রোড অব্দি আসতে পূর্ণিমাকে অনেকবার জিরেন নিতে হয়েছে। নিতের মা চোবসানো প্যাকাটির মতো আঙুলে গেলাশটা আগিয়ে দিল—চিনির

জলটুকুন খেয়ে নে মা। তারপর শুনছি। মানদার দাওয়ায় নিতের মা, মানদা, নিতের দজ্জাল বোন, রাধুদা সব পূর্ণিমাকে ঘিরে বসেছে। মানদা মেয়েটাকে কোলে টেনে নিল—ওদের মরণ হয়না! আর রাধুদা পূর্ণিমার শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে: মহল্লার সব মানুষের ডেরায় গিয়ে যা দেখেছো বলবে, শালারা কাগজে কাগজে মিথ্যে কথা লেখে ......মানুষ জানুক......। আর মেয়েটাকে মানদার কোলে অঘোরে ঘুমুতে দেখে পূর্ণিমা ভাবে—ডেরা তুলে দিয়ে ভালোই করেছে...তার এখন কত কাজ...।

মানদার উনুনে আঁচ পড়েছে। ধোঁয়া উঠছে আকাশে। এতোগুলো মানুষের কথা জট পাকিয়ে, বস্তির মাথার ওপর দিয়ে, ধোঁয়ার মতোই আকাশের দিকে ছুটছে। কথাগুলো আর বোঝার যো নেই। নানান কথা জড়িয়ে পেঁচিয়ে, তালগোল পাকিয়ে, এখন একটা শক্ত ডেলার মতো।

জননী

হাতের ফানা ভেঙে থুতনিটা রেখেছে সে। চোখ দুটো ফটফটা সাদা। মিলের শাড়ীটা মাটিতে লোটাচ্ছে। হুঁশ নেই। সে বেঞ্চের ওপর কোমল পা দুটো তুলে বসেছিলো। কপালের সিঁদুর ঘামে ভিজে এখন ঘন রক্তের ফোঁটার মতো। সামান্য চাপা নাকের ডগা বেয়ে ফোঁটাটা সূক্ষ্ম রেখার মতো নামছে।

—আপনি একা এসেছেন ?

—হ্যাঁ, কেন ?

—এদের কাছে একজন মহিলার একা আসাটা···!

—ও।

মাঝবয়েসী ভদ্রলোকের পুঁটিমাছের মতো চোখ দুটো ভীষণ ম্লান হয়ে গেল, ফ্যাসফেসে গলায় কথাটা বলেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসল। আঁচলের খুঁট দিয়ে সিঁদুরগোলা মুছতে মুছতে মহিলা হয়তো একটু হেসেছিলেন। হাসিটা কারো নজরে আসে নি। কেবল ঠোঁটের বাঁদিক ঘেঁষে আবছা একটা গর্তের মতো দাগ জেগেই মিলিয়ে গেল।

বেঞ্চিটায় আরো অনেক স্ত্রী পুরুষ, বালবাচ্চা বসে। বেঞ্চে জায়গা না পেয়ে লম্বা টানা বারান্দার এদিক ওদিক ছিটিয়ে বসেছে কেউ কেউ। সম্ভ্রমের সাথে

দু একটা কথা বলে কেউ : আপনার কে ? মহিলা মৃদু হেসে সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছিলেন। মাঝে মধ্যে এর ওর খোঁজ নিচ্ছিলেন। আহা! দেখবেন ঠিক বেঁচে আসবে।

—হ্যাঁ ভগবান আছে।

আবার একসময় হাতের উপর ভর দিয়ে থুতনি রেখে কি যেন ভাবেন, চোখ দুটো সাদা দু টুকরো পাথরের মতো হয়ে যায় তখন। আর সবাই তড়িঘড়ি স্লিপ পাঠিয়ে আনচান করছে। কিন্তু তাঁর যেন সবই জানা, একচুলও নড়লেন না, সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতার বিষণ্ন বিধুর চোখ-মুখের সামনে মহিলার মুখ অত্যন্ত দৃঢ় ঠেকছিল। যদিও তাঁর বয়স বেশী নয়, যদিও তাঁর সারা মুখে এক আশ্চর্য হিমশীতল ভাব।

—আপনার নামটা ?

তিনি গালের সেই অদ্ভুত গর্তটা জাগিয়ে হাসলেন।

—কেন ?

—সাক্ষাৎপ্রার্থীর নাম লিখতে হয়।

—ঠিক আছে।

—বলুন...কি বললেন ?

—বিজুর মা!

—আপনার নাম বলুন।

—ওই।

লোকটা যেন ঝাঁকানি খেল একটা। তারপরই চোখ তুলে চাইল। পরক্ষণেই নামিয়ে নিল চোখ। সিধে হেঁটে চলে গেল। মেঝেতে চটির ঘষটানিতে বিশ্রী ঘ্যাষঘেষে একটা শব্দ ওঠে। চটিটা সম্ভবত কাঁচা চামড়ার। বাতাসে একটা কূট গন্ধ ছড়িয়ে লোকটা চলে যেতে শাড়ির পাড়টা গোড়ালি অব্দি টেনে দিলেন।

—আপনার ছেলের বোধ হয় খুব নাম ছিল ?

—খুব!

মুখটা নাকের কালো তিল সমেত হঠাৎ ভার ভার হয়ে উঠল।

ম্যাড়মেড়ে সাদা ইউনিফর্ম সেঁটে সিপাইসাস্ত্রীর দল প্রত্যেক সিঁড়িতে যক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সজাগ পাহারা, ছুক ছুক চোখ। সিঁড়ি ডিঙোলেই তাল্লাসি দিতে হবে। তিনি কিন্তু তাল্লাসি নিতে দেননি। একজন সেপাই এগিয়ে এলে তিনি ম্লানভাবে হেসেছিলেন। প্রতিদানে ছোকরা সিপাইও হেসেছিল। তখনই তিনি গল্পটা বললেন। বহু পুরনো গল্প।

"গল্পটা বলেছিলেন আমার ঠাকুমা। আমাদের এই সোনার দেশে কোত্থেকে এক আপদ এসে জুটল। আসলে তাকে বলা উচিত ত্রিপদ। বলতও লোকে' তাই। বেজায় ঢ্যাঙা তিনটে পা ছিল তার। মানুষের তো দুটো পা থাকে... মানে সে ছিল সাক্ষাৎ শয়তান। মানুষ তাকে হত্যা করতে গেল। আপদের একটা চোখ পিত্তির ঢেলার মতো গলে গেল। তখনও ছলচাতুরী করে মিটমিট হেসে পিটপিট চোখে ভালোবাসার কথা বোঝাল তাদের। সবাইকে কি আর ভালবাসা যায়? তুমিই বল! থাকগে, তা হল কি, এই আপদের আসলে নাম ছিল কুবের, সে ছলচাতুরী করে মানুষের স্বর্বস্ব কেড়ে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হল। তখন গিনি আর সোনার কাল। ঘড়ায় করে গিনি আর সোনা মাটির নীচে গর্ত করে পুঁতে রাখত। অভাবী গরীবগরুবা বাপ মা তার কাছে সন্তান বেচে দিত। কুবের তাদের উলঙ্গ করে ধূপ ধুনো দিয়ে মাটির নীচে কবর দিত। দম আটকে জিভ ঝুলিয়ে শিশুরা মরত। মরে যক্ষ হ'ত। আসলে তারা তো আমারই ছেলে মেয়ে...।" শেষে কথাটা বেহালার টানের মতো টেনে দিল। সাদা চোখের জমিতে সেপাইসান্ত্রীর বেকুফ মুখগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ছোকরা সিপাই উসখুস করছিল।

—যান মা যান, অফ্সরকে বলবেন না।

কতকালের পুরনো কিস্সা। এই পোড়া দেশের হাড্ডিসার মানুষজন

কি আর এই বৃত্তান্ত জানে না। আসলে সেই নারীর মুখে কথাগুলো কেমন দিব্য জলজ্যান্ত হয়ে উঠছিল। ফচকে ছোঁড়াদের সাধ্য নেই ঠোঁট ওল্টানোর। কে জানে সে হয়ত তুপাতা আংরেজি কেতাব ঝাড়া বিদ্যেবুদ্ধির শিকড় উপড়ে ফেলবে: তোরা আমার পেটে হয়েছিস, আমি তোদের পেটে হইনি। বুঝ্লি? সেপাইসান্ত্রীর নাল-বাঁধানো বুটের খট খট শব্দ উঠছে থেকে থেকে। সঙ্গীনের ডগা চিক চিক করছে সজাগ পাহারায়। হেড অফিসটা প্রেতপুরীর মতো। কুবেরের ঐশ্বর্য আছে যেন আপিসটার চোরা কুঠ্রীতে। হেইই…হুঁশিয়ার। মুখের খসখসা চামে হাত বুলিয়ে, নানান ধান্ধায় অল্পতে বুড়িয়ে যাওয়া একটা মানুষ বিড় বিড় করল: ছেলে করবে দেশোদ্ধার, বাপশালা পুলিসের লাথজুতো খাক্।

মহিলার শান্ত এবং যে কোন নারীর মতোই অতিশয় সাধারণ চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল: সে তো কোনো অন্যায় করে নি! ছেলেরা অন্যায় করলে আগে ভাগে মার বুকে অমঙ্গল ডাকে।

ভদ্রলোকের মুখ থেকে বত্রিশ ভাঁজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে মড়াচাম জেগে উঠল। নিরীহ স্যাঁৎসেতে চোখ দুটো তুলে মহিলার দিকে ফ্যালফ্যাল করে খানিক চেয়ে থাকল।

চারপাশে ঝকঝকে শান খাওয়া সঙ্গীন লিকলিক করছিল। একজন গর্ভবতী রমণী তার গোবেচারা স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করল: বেয়নেটের ডগায় নাকি শঙ্খচূড় সাপের বিষ লাগানো থাকে?

বুটের শব্দটা আবার জাগল। খটখট একটানা শব্দে জবাবটা হারিয়ে গেল। ফোকতাই খেয়ে চোস্কা চেহারার ক'জন লোক, ধুরন্ধর চোখের তারা লাফিয়ে ছ-ঘরার পিস্তল খুলছিল আর বন্ধ করছিল। যেন দেয়ালা করছে। টোটাগুলো বের করে হাতের থাবায় রাখল একজন অফিসার!

—রাম, দুই…।

টোটাগুলো গিন্তি করছিল। আর আড়িয়ামেরে সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতাকে

দেখছে। চিম্‌সে মুখো এক সার্জেনের শ্বেতিধরা ঠোঁট চুলবুল করে উঠল, খানকির ছেলেকে এখনও জিন্দা রেখেছিস!

বেঞ্চে বসা মানুষজনের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চোখে মুখে ভয়ের কালা একটা ছোপ খেলল। মহিলার যেন ভয়ডর নেই। যেন কত মৃত সন্তানের সৎকার করে চোখের মতোই তার বুকটা পাথর হয়ে গেছে। কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না সে। কার কোলের শিশু কেঁদে উঠল: ওঞা! ওঞা!

মহিলা শান্ত কোমলভাবে বললেন: বাছাকে দুধ দিন। কথাটা ভয়ংকর শোনাল। দু একজনের বুকে তাগ্‌ত এল, ঠোঁটের কোণে হাসি জাগল একটু। এক ভদ্রলোক সহ্য করতে পারল না। ফস্‌ করে বলে ফেলল: এর মধ্যে দুধ!

আবার সেই টোল-পড়া হাসি।

—আপনি মার দুধ খাবার সময় আশপাশ দেখে খেতেন নাকি? ভদ্রলোকের মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। গলা ফাটিয়ে একটা হাসির ছর্‌রা ছুটিয়ে দিল কেউ কেউ। তড়িঘড়ি সিপাইসান্ত্রীর দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। দাব্‌না চাপড়ে দু একজন অফিসার তড়পাতে লাগল: অ্যাঁ, একেবারে প্রাণের বন্যা বইছে! দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাবে।

হাসিটা দম্‌কা বাতাসে উড়িয়ে মানুষগুলো চুপ মেরে গেল। কিন্তু চোখের কোণ চিকচিক করছে তখনও। বড়ো কর্তার আর্দালী চটি ঘষটে ঘষটে আবার মহিলার সামনে এসে দাঁড়াল। একফালি কাগজ বের করে আমতা আমতা করতে লাগল: আপনি কার সাথে দেখা করতে চান?

—আপনাদের কর্তার সাথে।

—কোন কর্তা?

—অনেক কর্তা নাকি!

—হ্যাঁ। বড়ো কর্তা···মেজো কর্তা···সেজো···।

—বড়োকর্তার সাথে। তার ওপরে কেউ নেই তো?

—শোনেন নি বাবারও বাবা আছে।

আমি একেবারে খাস আদিবাবার সাথে দেখা করতে চাই।

—তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়!

আর্দালি হাত নেড়ে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল। এবার সকলে টের পেল লোকটার ছিট আছে। আসা যাওয়ার পথে থেকে থেকেই আঙুল নাড়ছিল—শালা লাইফের কোনো দাম আছে, ধুস!

অল্পে বাত্তিধরা মানুষটা গালে পর পর বত্রিশ ভাঁজ ফেলে ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। দোতলার কোণের ঘরটা থেকে একটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে—নাঃ, বলবো না, না…না…।

—ছেলে কলেজে পড়ত।

—ও।

—কোনো অপরাধ করেনি!

—জানি।

—জানেন?

—হ্যাঁ।

মানুষটা ফ্যাল ফ্যাল করে মহিলার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। চাপা নাক। ছোটো হাঁ-মুখ। আর শ্যামলা বরণ। বয়েস অনুমান অসাধ্য। ধীরে ধীরে সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতা তার চারদিকে ঘন হয়ে গেল। এর ওর কথার জবাব দিচ্ছিলেন। অসীম ধৈর্য এবং মধুর ভঙ্গিতে। ক্রমে ক্রমে সবাই তাকে আপন করে নিল।

মাথার ওপর আচ্ছাদন নেই। নির্মম নিষ্ঠুর বিষুব অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন সূর্য তাদের মাথার ওপর। রুগ্ন একটা মেয়েমানুষ অসহায়ভাবে জিভ বের করে ঠোঁট চাটতে চেষ্টা করছিল। দুবার মাথাটা ঝাঁকিয়েই কাত হয়ে পড়ল, সাথে সাথে তিনি মেয়েমানুষটার মাথা কোলে তুলে নিলেন: একটু দুধ! রুমাল জবজবে করে ভিজিয়ে আনল একজন। রুমাল নিংড়ে নিপুণ হাতে তিনি

রুগ্ন মেয়েমানুষটার দু চোখে দু ফোঁটা জল দিলেন। ঢোলা ছেঁড়া সার্ট গায়ে বুড়ো মানুষটা এতক্ষণ ঝিমোচ্ছিল। ভাঁড়ে করে সেই একটু দুধ নিয়ে এল।

—আপনি যাবেন কি করে ?

—ওটুকু হেঁটেই যাব'খন।

আলাপ জমতেই মানুষটা সব বলেছিল। হাঁড়ি চড়ছে না। এমনিতেই পেট শুকিয়ে থাকতে হত অর্ধেকদিন। তার ওপর রোজগেরে ছেলেটাকে আটকে রেখেছে। সরকারের সাথে নাকি লড়তে গেছিল। মানুষটার গোল গোল লাল চোখদুটো চড়কি নাচন নাচছিল : বলুন দিকি। কেমন ধারা কথা ? বলে এমনিতেই শালা মরে আছি, পা শুকিয়ে যাচ্ছে, দুপা হাটলেই দম ধরতে হয়। দিন ভর যন্তর নিয়ে যুঝে পেটে দানা পড়ে নাকো। তার ওপর পুলিসের ঝামেলি। বলে ছেলে নাকি লড়তে গেছিল···তা আমি বলি খেতে না পেলে মানুষ কি করবে ? চিরকাল তো আর সমান যায় না !

মেয়েমানুষটার জ্ঞান ফেরাতে ফের দু ফোঁটা জল নিংড়ে চোখে দিতে হল। তাঁকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাল। যেন এইভাবে বহু মুমূর্ষু প্রাণীকে ক্রমান্বয়ে বাঁচানোর চেষ্টায় তিনি পরিশ্রান্ত। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করল : আপনি খেয়ে এসেছেন তো ? এ কথার উত্তরে মিহিন গলায় একটি মেয়ে বলল : কি করে উনি খাবেন !

—কেন ?

সন্তান অভুক্ত থাকলে মা কি করে খেতে পারে !

জনতা কথা বলছে খুব চাপা স্বরে। আর ভুবন ভোলানো হাসি দিয়ে তিনি মূর্ছিতাকে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করছেন। মুখের কাছে দুধের ভাঁড়টা ধরেছেন। মিহিগলার মেয়েটা বত্রিজভাঁজ মানুষটাকে বলল : দেখেছেন, দেখেছেন ওনার চোখ দুটো ! কি স্নেহময়, না ! তারা সবাই একসাথে মহিলার দিকে তাকাল।

—ওরা আপনার কটা ছেলেকে পুরেছে ?

—আমার সংসারটাকেই।

—কটা ছেলে আপনার?

—সাতটি।

—সাতজনকেই?

—হ্যাঁ।

—আপনার স্বামী?

—নিরুদ্দেশ।

—অদ্ভুত প্রশান্তির সাথে তিনি কথাটা বললেন। মৃত্তিকার মতো এই সহনশীলতা যেন তাঁর সহজাত।

তিনতলার চিলেকোঠার মতো জায়গাটায় আগুনের হল্‌কা ছুটে আসে। আকাশটা আগুন ঢালছে। মাথার তলায় ইঁট দিয়ে এক বৃদ্ধা শুয়ে পড়ল। সেপাইসান্ত্রী অবিরাম টহল দিচ্ছে। অফিসার আর কর্তাব্যক্তিরা ঠোঁট জিভ রসে জবজবে করে পান চিবোচ্ছে। মানুষের রক্তের মতো ক্ষীণ তরল ধারা মুখের কষ বেয়ে নামে। তারা পকেট থেকে ধবধবে সাদা রুমাল বের করে পানের পিক মুছছিল। আর অট্টহাসিতে সেই সুরক্ষিত ব্যয়বহুল বিল্ডিংটা গমগম করছে। গজরাচ্ছে। হত্যাকারীর মতো রাগে গরর্‌ গরর্‌ করছে।

সাক্ষাৎপ্রার্থী জনতা ক্রমশ আরো ধৈর্য হারাচ্ছে। যেন বাঁধ ভাঙছে। ধীরে ধীরে বোধাবোধ লোপ পাচ্ছিল। দুজন সেপাই আর সার্জেন, ধোলাই ঘর থেকে এক তরুণকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তরুণের পাজামার ডান পা'টা লালরঙে ছোপানো। ভীষণ দুর্বল একটা মানুষ বেঞ্চের শেষ দিকে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ ফ্যাকাশে আঙুল নেড়ে সে "অন্যায়" শব্দটা উচ্চারণ করল। সার্জেন্ট আর সেপাই সাথে সাথে এক ঝটকা মেরে ঘাড়টা ফিরিয়েই খিঁচিয়ে উঠল: কোন শালা রে! খানিক চোখ ঘুরিয়ে খোঁজে, কিন্তু ঠাহর করতে না পেরে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল। কুত্তা যেমন করে সাতদিনের বাসি হাড় কামড়ায়। জনতা কাণ্ড দেখে হাসল।

মহিলাকে আগুনের কুণ্ডের মতো ভেবে জনতা তার চতুর্দিকে ঘন হয়ে বসেছিল। যেন খুব শীতার্ত রাতে এক আদিম মাতৃতান্ত্রিক পরিবার শরীরে ওম দিচ্ছে। হঠাৎ ডাক এল তাঁর। ডাক ঠিক নয়, সেই আর্দালি বিড বিড় করতে করতে এল কাঁচা চামড়ার গন্ধ নিয়ে—চলুন। বাতাসটা ফের কূট গন্ধে ভরে গেল। সকলের দিকে মধুর ভাবে চেয়ে সটান পা ফেলে আর্দালির পেছন পেছন চললেন।

অসহ্য উত্তাপ আর দুশ্চিন্তায় জনতা ভেঙে পড়ছিল। কে একজন হাতের ফানা কামড়াতে লাগল রাগে। এক সেপাইয়ের বুটের তলায়, ইট মাথায় দিয়ে শুয়েছিল যে বৃদ্ধা তার পা'টা চেপটে গেল। বুড়ী যন্ত্রণায় ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। কে যেন ধমকে উঠল: এদেশে আর কি চান! মিছিগলার সেই মেয়েটার মুখে বিদ্যুত খেলল: জানেন আমাদের পাড়ার এক বুড়ীকে জিপের পিছনে দড়ি বেঁধে টেনেছে!

বড়োকর্ত্তার হিমঘর থেকে মহিলার গলা ভেসে এল: না ছেলেরা কোনো অন্যায় করেনি, সন্তান কোনো অন্যায় করলে আগে মার বুকে কু ডাকে। শব্দটা ধোলাই ঘর, সিঁড়ি আর থামের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। জনতার ভেতর থেকে একজন ঘোষণা করল: চুপ করুন! মা কথা বলছেন!

—মা!

—হ্যাঁ, মা।

·

···কখন অপরাহ্নের সূর্য হেলে পড়েছে। জনতা উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তায় গুম মেরে বসে আছে। অনেকেই সাক্ষাতের অনুমতি পায়নি। যাদের হয়ে গেছে তারাও নড়ছে না। কারণ মা এখনও ফেরেনি। সিপাইয়ের ডিউটি বদলে গেল: ডি. সি. আর কারো সাথে দেখা করবেন না। কেউ জবাব দিল না। অফিসার চলে যেতে বত্রিশভাজ ভদ্রলোক আপন মনে বিড বিড করলেন। মা এখনও ফিরছে না কেন? কি হতে পারে?

সেই ম্লান মেয়েটি গভীর দুঃখের সাথে বলল : মাকে ওরা ধর্ষণ পর্যন্ত করতে পারে। কথাটা শুনে চোখের সাদা কোণ ফাটিয়ে ধোলাই ঘরের দিকে চাইল একজন : সহ্যের সীমা আছে !

—এখানে কি করবেন, হাত পা বাঁধা ?

—তাই বলে··· ।

বেঞ্চি ছেড়ে তিতিবিরক্ত জনতা উঠে দাঁড়িয়েছে। উদ্‌বেগে মুখে কথা জোগাচ্ছে না। বত্রিশভাঁজ ভদ্রলোক বললেন—ডি. সি'র ঘরে যাব চলুন। কথাটায় কেমন আস্থা ছিল, ঝটপট সব ঘরটার দিকে মুখ ফেরাল। দু-একজন মেউ মেউ করছিল। সেই মেয়েটার রুক্ষ খসখসা মুখ শক্ত হয়ে উঠল : তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি ? জনতা শামুকের মতো পায়ে পায়ে বড়োকর্তার ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। নিঃশব্দে। সেপাইসান্ত্রী, অফিসার, রাইফেল, পিস্তল বুট, কার্তুজ নিয়ে নির্বোধের মতো টহল দিচ্ছে। তড়পাচ্ছে। এর শেষটা কোথায় তারা কেউ আঁচ করতে পারল না।

ভুখ হরতালের একহপ্তা

আজ নিয়ে হপ্তা পুরো হল। দাঁতে দানা কাটছে না কেউ। পাঁচ ড্রাম ভাত পচে গেঁজে উঠেছে। বিশ শালিয়া ফারুক মিঞা তাই চাট্টি নিয়ে ফুটিয়ে চোলাই বানাল তিন দিনের দিন। সুদর্শন জমাদার তিন দিন পরেই দাওয়াই দিতে ফারুক আর জনা তিনেক সেপাই নিয়ে ওয়ার্ড থেকে সব চাঁইগুলোকে টেনে বের করে সেলে পুরে দিয়েছিল। তবু হপ্তাভর এই চলছে।

বড জমাদারের খাকি ঢাউস হাফ প্যান্টের ভেতর দিয়ে ডোরাকাটা আণ্ডার প্যান্ট হাঁটু অব্দি ঝুলে নেমেছে। গোচ শুদ্ধু ধুমসো পা জলদি চালাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল আর একটু হলে। গুমটির কাছ থেকে সেপাইরা চিল্লিয়ে ডাকছেঃ জমাদার সাহাব! ও জমাদর সাহাব! সুদর্শন জমাদার জানে গুমটিতে না গেলে ওরা মা মাসী তুলে খিস্তি দেবে। কিন্তু ফুরসৎ নেই। গুমটির তলায় সব গুজগুজ ফিসফিস করছে। লিভারের গোলমালে বড় জমাদারের মুখে কালো ছোপ পড়েছে। ফুটো, ফুটো। কোদাল দাঁত নিচের ঠোঁট ঢেকে থুতনিতে এসে ঠেকেছে।

অড়হর ক্ষেতির আলে বসে বাপ বলেছিলঃ বেটা গাধার মতো মেহনত করবি, শুয়োরের মতো গিলবি, আর ভঈসের মতো নিদ দিবি। সুদর্শন জমাদার কথা ফেলেনি। এখন সে একটুতেই ভঈসের মতো হাঁসফাঁস করে। ডানহাতি লম্বা ফালির মতো টিনের দরজাটায় একটানা লাথ মারতে মারতে ঘেমে উঠল। গেট সেপাই চাবির গোছার ঝম্ ঝম্ শব্দ তুলে ছুটে এল।

—শুয়ার কা বাচ্ছা শুনতা নেহী।

—দেখিয়ে জামাদার সাহাব !

—চোপ শালে !

গান্ধীটুপির মতো খাকি টুপিটা হাতের থাবায় নিয়ে মেঝেতে ডাণ্ডা ঠুকতে ঠুকতে চলল। কুতকুতে চোখ দুটো এক ঝটকায় জেলগেটের লোহার গরাদের ওপাশে লোকজনের অস্থির ভিড়টা দেখে নিল।

হাঁটু মুড়ে থ্যাবড়ে সব বসে আছে। শিশুদের মাথায় আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে। হাত পা নেড়ে বিড়বিড় করছে। এখান থেকে একটাও কথা মালুম হয় না। কেমন একটা গুঞ্জন। শোকের চিহ্নের মতো কালো ছাতাগুলো মেলে রেখেছে। রুগ্ন এক যুবতী খালি এদিক ওদিক ছুটছে। কি যেন বলে গুম ধরে। আবার গুঞ্জন ওঠে। দু'এক জনের মুখে বিরক্তির আঁচড় ফুটছে। দড়াপাকানো একটা মানুষ একসাথে দশটা আঙুল মটকে খিঁচিয়ে উঠল : উচ্ছন্নে যাক ! শা শা লা। গরাদ মুঠো করে চেপে কে একজন প্রিয় জনের মুখ খুঁজছিল। গেট সেপাই ডাণ্ডা দিয়ে গরাদে বাড়ি কষাল : শূয়ার কি বাচ্ছা !

বড় জমাদার গোদাপা নিয়ে নড়তে পারছে না দিনকে দিন যেন আরো পানি জমছে। ঠায় দাঁড়িয়ে বাইরের ভিড়টা খানিক দেখল। চোখ ফেরাতে পারেনা। অত্তোগুলো মানুষ মিলে মিশে লেপ্টে কেমন রক্ত মাংসের একটা ঢেউ। হাত তুলে কেউ কেউ চীৎকার করছে। শাপমন্যি দিচ্ছে। বুকে ছ্যাঁকা দেয়। আর দাঁড়াল না। তুরন্ত পা টেনে চলল জেলারের ঘরের দিকে। ঘেমে নেয়ে উঠেছে মানুষটা। ধরাস ধরাস করে বুকের ভেতর কিল খায়। ফুলো পা টেনে অদ্দূর যেতে পারল না। মোলাকাতী বেঞ্চে ধপাস করে গতর ছেড়ে দিল। টুপিটা খুলে হাওয়া খেতে লাগল। খাঁকি উর্দ্দি ফাঁক করে বুনো ঘাসের চাপড়ার মতো লোমশ বুকে হাওয়া করল (গরমি, বেজায় গরমি !)। ডান পায়ের গোদটা যেন দিনকে দিন আরো ঢোসকা হয়ে উঠছে। কদিন যাবৎ বুট গলালেই চিগিড় দিয়ে ওঠে বেদনা। যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে। তারপর কি বেরোবে কে জানে। পানি না খুন ?

—হেই…ই……ই…হঠ্।

ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং শব্দে বড় গেটটা খুলে দিল। কপালে কব্জি ঠেকিয়ে দুপাশে দুজন সেপাই সেলাম ঠুকছে। সাথে সাথে দুপায়ের বুটে ঠোক্কর লাগিয়ে খট করে একটা শব্দ তুলল। আই, জি'র ইজ্জত। জনতাকে হঠাতে সেপাইর দল মাথার ওপর এক চক্কর লাঠি ঘুরিয়ে নিল। ভিড়ের ভেতর থেকে একজন সাদা আরশুলার মতো ভ্রুজোড়া কপালে তুলে মুখের একপাশ বেঁকিয়ে হাসল : আই জি আবার হ্যাট চাপিয়েছে মাথায়, এদিকে তো বামন বীর!

—টুপির জন্য চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গ্যাছে।

—দেখতে পাচ্ছে!

—কানা!

ছাতাগুলো পট্ পট্ করে বুজিয়ে ফেলল। দু একটা ছাতা এখনও মেলে রেখেছে পেছন দিকে হেলিয়ে। দিনভর একটু একটু করে রোদে চামড়া পুড়িয়ে মানুষগুলোর চেহারা কথাবার্তা সব কাঠ কাঠ হয়ে উঠেছে।

পেট ঠেসে সেলাম গিলতে গিলতে সব কর্তাব্যক্তিরা জেলারের ঘরের দিকে চলল। ততক্ষণে গোদাপায়ে ভর দিয়ে বড় জমাদার উঠে দাঁড়িয়েছে। জরুরী তলব। এসপার ওসপার হয়ে যাবে আজ। আজব ফ্যাসাদ। এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সুদর্শন জমাদার অজান্তে হাঁক দিয়ে উঠল—হেই…ই ই হঠ্। শেষে কোঁৎ পাড়ার মতো শব্দটা তলপেটের নীচে ঠেলে দিতে গিয়ে পানি ঢোসকা গোদ ফেটে যাওয়ার দাখিল। কোনমতে সামাল দিল।

জেলারের চেয়ারে আই, জি, বসেছে। আই, জি'র গায়ের রঙ ধবল রুগীর মতো সাদা। আর একটুখানি নাক। ফুটকিরি মতো দুটো গর্ত।

—কি? কেউ খাচ্ছে না?

আই, জি নাকে কথা বলে।

সুদর্শন জমাদার—নেহী।

আই, জি—পাইপ?

জেলার—ঠেলে দিচ্ছে।

আই, জি—কদিন হল যেন ?

জেলার—সাতদিন।

আই, জির নাকি গলা আর শোনা গেলনা। হাল খারাপ ঠাহরে চুপসে গ্যাছে। বিজগুলি নাকটা তিরতির করে কাঁপছে। শোলার টুপিটা খুলে ফেলল। কাঁচা পাকা দু'এক গাছা চুল শুদ্ধু মরার খুলির মতো মাথাটা বেরিয়ে এল। সুদর্শন জমাদার প্যাট প্যাট করে মাথাটার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবছে, দিমাগের কাম করতে করতে এই হাল। টেবিলের ওপর আই জি দু কনুই ভেঙে মাথাটা ধরে আছে। চক্ চক্ করছে খোপরি। রুপোর টাকার মতো। প্রকাণ্ড মুখটা ভ্যাট্‌কে জেলার একটা হাই তুলল। নীচের পাটির দাঁতে কট্ করে একটা শব্দে বেঁকে গেল। সুদর্শন জমাদার আই, জির খোপরিটা নজর করছিল, আর ভাবছিল: জরুর একটা রাস্তা বাৎলে দেবে!

—খুলে বলুন সব!

সোলার হ্যাটটা তড়াং করে মাথায় চড়েছে। নাকি স্বর পাতলা সর্দির মতো গোঁফের ফাঁকে গড়ান দিয়ে নামল। বেড়ালের মতো রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ।

জেলারের ঠাণ্ডা শেতল ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো চামড়া ফেঁড়ে জেগে আছে। ছোট ঝকঝকে ঘরটায় চোখদুটো পিটপিট করে জ্বলছে। জেলার মাকুন্দো মুখ নেড়ে সুদর্শন জমাদারকে সমঝে রেখেছিল আগে ভাগে: তুম রিপোর্ট করেগা। বড় জমাদার গেট সেপাই হারাধনকে পটিয়ে বাংলায় লিখিয়ে নিয়েছিল। ফালি কাগজে। হারাধনও ছাড়ার পাত্তর নয়। এই মওকায় আগলা হপ্তায় হসপিটাল ডিউটি বাগিয়ে নিয়েছে। রুটি মাখন চালান যাবে চিমসে পেটে। আর ঢোলা প্যানটুল্লের পকেটে ওষুধ ঝাড়া দু দশ রুপেয়া। জেলার বড জমাদারকে চোখ মারল। সুদর্শন জমাদার তরাক্ করে পকেট থেকে কাগজের ফালিগুলো টেবিলের ওপর রাখল: এই যে স্যার!

আই, জি—হ্যাঁ পড়ুন দেখি, বেশ……।

আই, জি'র নাকি গলা পিষে, গোটা জেল কাঁপিয়ে আওয়াজটা হঠাৎ জাগল। দড়িয়া হাজত, সাতখাতা আর চোরাকুঠরীর মতো অন্ধকার সেল থেকে ভুখা মানুষের গলা ডেলা পাকিয়ে ছুটে আসছে। টিনের গেটটা কাঁপছে। ঝন্ ঝন্ ঝন্। শব্দ ওঠে।

—খুনী সরকার হো বরবাদ!

—হো বরবাদ! হো বরবাদ!

আই, জি'র বিলাই গোঁফ খাড়া হয়ে ওঠে। মাথা থেকে হ্যাটটা নামাতে গিয়ে, একটু টেনেই ছেড়ে দিল। শরীলটা আলগা হয়ে গেল। আর হ্যাটটা নাকের ঠেকনা পেয়ে আটকে রইল। বড় জমাদার আই জি'র শ্যাতা ঠোঁট দুটো নড়তে দেখল। ঠোঁট দুটো আপনি আপনি খুলছে আর জুড়ছে। ফলে একটা শব্দ ওঠে: ফট্ ফট্ ফট্। বড় জমাদার গোদা পা ঠুকে আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল: হেই ই ই হঠ্। বাইরে থেকে সাড়া দিল সেপাই, চাবি সেপাই আর তল্লাশীর দুজন—হেই ই ই। বড জমাদার উঁকি মেরে গেটের বাইরে গিঁট পাকানো ভিড়টা দেখতে চেষ্টা করছিল। সব উঠে দাঁড়িয়েছে। সাদা রুমাল নাড়ছিল তারা। ভরা ভরা মুখ এক মহিলা চীৎকার করল: ওরা শ্লোগান দিচ্ছে!

—আমাদের ছেলেরা!

—তাহলে ওরা জিন্দা আছে?

—এক হপ্তায় ওদের কি হবে, মায়ের দুধ খায়নি!

দড়িয়া হাজত থেকে হাড়গোড় ভাঙ্গা বন্দীদের চীৎকারটা তখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে। শব্দটা কানের পর্দা ফাটিয়ে বুকের ভেতর পিটতে থাকে। সুদর্শন জমাদারের পানিখাওয়া ঢোসকা পা টনটন করে। ওপরের পাতলা চামড়াটা যেন ফোসকার মত ফেটে যাবে। আই, জি রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ জিভ দিয়ে মুখের ভেতর টেনে দাঁত দিয়ে কাটছিল। সুদর্শন জমাদার ভড়কে গিয়ে জেলারের মেয়েমানুষের মত মুখের দিকে চেয়ে থাকে। গোদা পা অসাড়। টেনে তোলার ক্ষমতা নেই।

—নাড়া লাগানা হো গিয়া।

—ঠোঁটের ডগা থেকে ঘাম মুছে সুদর্শন জমাদার হাই তুলল।

আর কোন শব্দ নেই।

আর্দ্দালী বেচু ঠাণ্ডা জল দিয়ে গেল।

আই, জি চুক চুক শব্দে টাইম নিয়ে জল খেতে লাগল।

জেলার—কই দেখি!

আই জি—হ্যাঁ, পড়া হোক।

সুদর্শন জমাদার—লিজিয়ে।

আই, জি, টুপিটা মাথায় চাপিয়ে, পকেট থেকে রুমাল বের করে পুঁচকে নাকটা মুছল। সুদর্শন জমাদার ভাবছিল আই, জির খোপরি নিয়ে। ঠিক একটা রাস্তা বাতলে দেবে। দিমাগওয়ালা লোক। আর জেলার গড় গড করে ধীরাপাতের মতো পড়তে লাগল।

সুদর্শন জমাদারের রিপোর্ট :

সেদিনটা ছিল এতোয়ার। রোববার। বকুলতলার পেছনদিকের বড চৌকার লাগোয়া ফাইল থেকেই নাড়া উঠল। তার আগের দিনই মেদিনীপুর আর বহরমপুর জেল থেকে চালান এসেছে রাজনীতি কেসওয়ালা একগাদা। বৃটিশ জমানা থেকেই এমনিধারা কেসওয়ালা সব সাতথাতায় থাকে। তো এবার ওপর থেকে হুকুম ছিল কেউ নাড়া লাগাতে পারবে না (জেলার এখানটায় একটু থামল। আই জি চোখ বুজিয়ে শুনছিল। থামতেই ধড়ফড় করে উঠল : কি হল ? জেলার ফালি কাগজে চোখ রেখেই বলল : আপনার কথা মত আমরা বইপত্তর পড়া শ্লোগান দেওয়া মিটিং করা সব নিষিদ্ধ করে দিই। ছিপিয়ে চলত তাও একটু আধটু). একদিন গেল দুদিন গেল নাড়া আর বন্ধ হয় না। শেষে পেটানো শুরু হল। সেলে বন্ধ করতে লাগলুম। কিছুতেই সামাল দেওয়া যায় না। একদিন দেখি সেপাইরা অব্দি তাল দিচ্ছে। বাপ আমাকে বচপনে শিখিয়েছিল—বেটা গাধার মতো মেহনত করবি, শূয়োরের মতো গিলবি, আর ভঈসের মতো নিদ দিবি। কাম কাজ খাওয়া শোওয়া ছাড়া দিমাগ ঘামাই না। আর এ শালার সেপাইরা দেখি সব বাতচিত করে—কিসের লড়াই, তো কি হবে

…সাত সতেরো। আমার কেমন সন্দ হল। ফের একরোজ সেল ঘুরতে গিয়ে দেখি সেপাই এক সেল থেকে আর এক সেলে চা পৌছে দিচ্ছে। তখন সাঁঝের টাইম। তো আমি জেলর সাবকে রিপোর্ট করলাম (জেলার হেসে ঘাড় নেড়ে নিল বার দুই)। তারপর আসলী বাত জানা গেল। জোর পুঁছনাছ করতে জানতে পারলুম ঐ নাড়া লাগানোর জন্ত এসব হচ্ছে। সাচ্চা বাত। এমনি সব কথা বলে, একেবারে মানুষের ভেতরের কথা। বুকে ছ্যাঁকা লাগে। দু চারজন সেপাইকে মানা করলুম বাতচিত করিস না। তো আমার ওপর তেড়িয়া হয়ে এল। উল্টে গল্প চলতে লাগল। এখন যদি সেপাইদের মগজে এসব ঢোকে তো সর্বনাশের ডানা গজাবে। তখন সেলে ঢুকিয়ে যারা আওয়াজ পয়লা তোলে এমনি দু চারজনকে পিটিয়ে শুয়ার বানানো হল। ব্যাস! আর যায় কোথায়! নাড়া তো রোজানা চলছেই ; তার ওপর ভুখ হরতাল। ওদিকে আবার বাপ মা ছেলে বৌ কাচ্ছাবাচ্ছা গেট আগলে বসেছে। তুরন্ত কোন ব্যবস্থা না হলে আমরা ডিউটি করতে পারবো না………।

শেষের দিকে কি একটা আর্জি ছিল। জেলার আর সেটা পড়ল না।

আই, জির চোখ দুটো তখনও বুজে আছে। সুদর্শন জমাদার আই, জির কাছিমের খোলের মতো মাথাটার দিকে চেয়ে ভাবছে : দিমাগওয়ালা আদমী। এমনি দাওয়াই দেবে সব সিধে হয়ে যাবে। ভাবতেই, একটা লম্বা হাই উঠল।

আর্দালী বেচু কপাটটা ফাঁক করে ভেতরে চুপি দিল। কাতলা মাছের মুখের মতো কপাটটা ফুট কাটছে। প্যাংলা হাতটা বাড়িয়ে জেলারের হাতে একফালি কাগজ দিল : বাইরের লোকজন দিল। কাগজের ওপরে বড় বড অক্ষরে লেখা : ভুখ হরতালের হক দাবী মানতে হবে। আই, জি'র বিজগুলি নাকটা বারবার কুঁচকে যাচ্ছিল চিঠিটা পড়তে পড়তে। জেলার কাগজখানা না পড়েই আই জির হাতে দিয়েছিল। এখন খুঁটিয়ে আই, জি'র মুখটা দেখছে। যেন অক্ষরগুলো গেলার পর আই, জির মুখে তার ছাপ পড়বে। আই জি দুবার

গলা খাকরি দিল। কাগজটা টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রাখল। শেষে মুখ খুলল সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে : ওরা নড়বে না বলছে।

—লেকিন সাব……।

জেলার আধখানা হাত তুলে বড় জমাদারকে রুখে দিল।

সুদর্শন জমাদার ড্যাবড়া চোখে আই, জি'র দিকে তাকিয়ে আছে।

আসলে দেখছে খোপরিটা।

দেয়ালের গায়ে টিকটিকির ঢাউস পেটটা ধুক ধুক করছে।

—"হ্যাঁ শুনুন। ওরা চেঁচিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে এই তো। জমাদার বলছে সেপাইদের দিমাগ বিগড়ে দিচ্ছে। ঠিক আছে। কিন্তু ওদের শ্লোগান যদি কেউ না শোনে……। কেউ মানে সেপাইরা।"

আই জি কথাটা ঝুলিয়ে দিল। চোখ দুটো পিটপিট করছে। জেলার আর জমাদারের মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

জেলার ॥ মানে আপনি বলছেন সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো বোমার আওয়াজ থেকে বাঁচতে সবাই কানে তুলো গুঁজে দেবে।

সুদর্শন জমাদার ॥ কা তাজ্জব বাত!

আই জি ॥ না তুলো দিতে হবে না, কানে আঙুল দিলেই চলবে।

সুদর্শন জমাদার ॥ ডাণ্ডা কি করবে!

আই, জি ॥ কোমরে ঝুলিয়ে নেবে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জেলার বেল টিপে আর্দ্দালী বেচুকে ডেকে চা আনতে বলল। আর সুদর্শন জমাদার আই, জি'র পাকা বেলের মতো মাথাটার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। যেন খালি চোখে খোপরি ফাটিয়ে মগজের ত্যালতেলে পদার্থটা অব্দি দেখতে পাচ্ছে!

পরদিন সকালে জেলগেটের ভেতরে ডান পাশে, ডি, ও'র টেবিলের ওপর

দিকে নাটা বেচু টুল লাগিয়ে নোটিশটা মেরে দিল। আর নোটিশ পড়তে পড়তে সেপাইদের মুখ বিলকুল বুরবাকের মতো হয়ে যায়। ফের বানান করে পড়ে :

অন্দর ডিউটি করার টাইমে সব সেপাইকে দুকানে আঙুল গুঁজে রাখতে হবে। নিয়ম না মানলে সাথে সাথে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে।

অকাল বোধন

নবমী তিথি। কাঞ্চন, জবা, মল্লিকা, মালতী, আর রক্তের ফোঁটার মতো গাঢ় লাল অশোক ফুলের ডালিতে দু ফোঁটা নোনা ঘাম ঝরে পড়ল। কপাল বেয়ে এঁকেবেঁকে এসে টস করে ফুলের ডালিতে ঝরে পড়ল সেই ঘাম। দুবার; পরপর। অকালে দেবীর আরাধনায় মগ্ন রামচন্দ্রের কপালে কুঞ্চন। সৃষ্টির মাতা সুপ্রসন্ন হলেন না তথাপি। মঙ্গলের আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় অকালবোধন বুঝি ব্যর্থ হল। আবাহনে দেবীর মন টলল না। তখন বিভীষণ বললেন, অষ্টোত্তর শত নীল পদ্মে পুষ্পের ডালি সাজতে। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ছেঁচে ছেনে পাহাড় সমুদ্র আর সমতল ভূমি চষে রামচন্দ্র নীলপদ্ম ছিঁড়ে আনলেন। জলদ গম্ভীর স্বরে সৃষ্টির মাতার স্তুতি গাইতে লাগলেন। মাতা প্রসন্ন না হলে বন্দিনী প্রিয়ার মুক্তি অসম্ভব। কাশ ফুলের বনে মৃদুমন্দ বাতাসের দোলা, আর চাতুরী করে দেবী লুকিয়ে ফেললেন একটি পদ্ম। তপস্যা বিফলে গেল বুঝি, ইহ জীবনে বোধ হয় আর চার চোখের মিলন অসম্ভব, মানুষের পবিত্র শ্রম বুঝি কোন নিষ্ঠুর মুনির শাপে ভস্ম হল। গাণ্ডীবে টঙ্কার জাগালেন বীর, আসমুদ্রহিমাচল সেই শব্দ বুকে নিয়ে সৃষ্টির যন্ত্রণায় বেঁকে যেতে লাগল। আর শোনা গেল বীরের কণ্ঠস্বর :

কমল লোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে
একচক্ষু দিব আমি সঙ্কল্প পূরণে ॥

রাতভর ইঁদুরপচা ভ্যাপসা গরমি, আর ভোর রাতে হৃদপিণ্ডে বরফ জমানো বাতাস চাবুকের মতো সপ্ সপ্ শব্দে মেটলির মতো হতাশ পাঁচিল টপকে এসে সেলের ভেতর ধামসে পড়ে।

তখন ভোর হয়। ভোর হয় মঙ্গলের আধকানা চোখের টাটানিতে। জেলগেটে ডিউটিবদলের গরুর চামড়ার পুলিসীবুটের মচ মচ শব্দে। রাতভর গরমি কুত্তার মতো খোঁচ পেটে হাঁপায়। আর ভোর রাত্তিরে গরাদ দিয়ে এসে ঠাণ্ডি বাতাস হামলায়। তখন মঙ্গলের হাত পা কুঁকড়ে পেটের ভেতর সেঁধিয়ে আসে। অথচ চুলকানির ভয়ে কম্বলটা টেনে নিতে পারেনা। কম্বলের খসখসা রোঁয়ার কথা ভেবে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। কানা চোখটার কথা ভাবে। সারারাত মশা থাবড়ে আর হাজার কিসিমের ভাবনায় জাগান দিয়েছে। এখন আধকানা চোখটা জ্বালা যন্ত্রনায় মঙ্গলকে খুবলে খাচ্ছে। জাগ ধরে উঠেছে। জল কাটছে। মঙ্গল জানে চোখ জোড়া খোয়াতে হবে। একটার সাথে আরেকটাও ধরেছে। এখন মেটলির টুকরোর মতো লাগে পাঁচিলটা। এখন আর ও সাফসুফ দেখতে পায়না। রাত কাটে গরমিতে, ঠাণ্ডিতে, চোখের টাটানিতে। আর মজবুত স্বপ্নের গাঢ় রঙে।

সেদিনও তাই। ঘুম এসেছিল এক্কেবারে শেষকালে। বেহুঁশ ঘুম। আসলে তো ঘুম নয়, বেহুঁশ হয়েছিল মরার মতো। তখন থেকেই গরাদের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বরফের ছুরির মতো ছাল চামড়া ছাড়িয়ে শিরদাঁড়ায় গিয়ে বিঁধছে।

পয়লা বাইশ সেলের হুড়কো টেনে জমাদার রাবনের গলা গাঁ গাঁ করে ডেকে উঠল সাইরেনের মতো:

এ পয়লা বাইশ গিনতি···ই···ই··· গি ··ন···তি··· গি···ই···।

চাবির গোছা নিয়ে জমাদার জেলখানার এক ছিঁটে স্বস্তি অসাড় বেবশ ঘুমের গলা বুটের তলায় পিষে হাঁক দিয়ে ওঠে। সার সার মানুষ খোপ থেকে ছুটে

আসে চোখের পিচুটি নিয়ে। উবু হয়ে বসেই অর্শের যন্ত্রনায় মহিমদা দাঁতে দাঁত ঘষে। আর জমাদার লাঠির লোহা বাঁধানো ডগায় গিনতি করে: রাম দো··· তিন··· এ শালা সিধা হো যা···ফিরসে···রাম···দো.. তিন···। চোক্কুয়া ফিরোজ তো উবু হয়ে বসে একদিন হেগেই ফেলেছিল। আর সেই হালতে ডাণ্ডা চলল।

নামতার মতো সেপাই জমাদারের গিনতি এগোয়। আর ডাণ্ডা ঠোকার একটা শব্দ। শব্দের প্রতিধ্বনি।

বাইশ···বাইশ···হ্যাঁ···কয় আদামী ···চোওবিশ···চোওবিশ। গিনতির সংখ্যাগুলো অব্দি পাঁচিলটা গেলার জন্যে হাঁ হয়ে আছে। গাঁক করে গিলে ফেলে। আবার উগরে দেয়।

রাত দুটোয় একবার দফা বদলী হয়। সেলের চোরাকুঠ্‌রীর মতো ছোট্ট দরজাটা ঠেলে নয়া সেপাই হাঁক দেয়: হেই্‌ই। ডিউটি সেপাই মা তুলে খিস্তি করে। মঙ্গল তখন গরাদের ফাঁক দিয়ে দুটো ঠ্যাঙ বের করে গরমির হাত থেকে রেহাই পেতে হাঁসফাঁস করে। তখন ঘণ্টা বাজে, টিংটিং করে। দুটোর ঘণ্টা। মানুষটা জাগান দেয় তখনও। এখন শুক্লপক্ষ। মজুরের হাসির মতো ফটফটা জোছনায় জেলখানাটাও নেয়ে ওঠে। গোটা পৃথিবী আড়াল করে পাঁচিলটা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইট, চুন, বালি, সিমেণ্ট মিলে কংক্রীটের এই পাঁচিলটা যেন জ্যান্ত হয়ে যায়। মঙ্গলের ঝাপসা চোখে, একটা বিরাট হা মুখ ভেসে ওঠে। যেন গিলতে আসছে। টাওয়ারের ওপর সেপাই'র সঙ্গীনের ডগায় জোছনা খেলছিল। লকলক করছিল সঙ্গীনটা। টাওয়ারের ওপর বন্দুকধারী সেপাইটা রোজ ঢোলে। ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ ধরফরিয়ে উঠে বন্দুকটা হাতড়ায়। এসব দেখতে দেখতে রাত কাবার হয়ে আসে। তখন আর চোখ টেনে রাখতে পারে না। আর জাগান দিতে পারে না।

আকাশটা চাঁদোয়ার মত মাথার ওপর টানানো। মেঘ। আর রঙ্‌। কখনও পেঁজাতুলোর মতো মেঘে ভয়ঙ্কর জন্তুর ছবি জাগে। আবার মানুষের মুখের আদল আসে। আকাশটা ঢাকতে পারেনি। অথচ মঙ্গলের দেখতাই

পাঁচিলটা চড়চড়িয়ে তিন হাত ওপরে উঠে গেল। ভুখ হরতালের পর একদফায় এক হাত উঠল। ফের দু দুফা গোপন সর্তকতায় আরো দু হাত। অশোক গাছটা আর নজরে আসে না। গাছটা কি এক আহ্লাদে পাগলের মতো চারদিকে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। গাছটার দিকে মঙ্গল ঠায় চেয়ে থাকত। এখন গাছটা মালুম হয় না। কেবল অশোক ফুলের লাল ফুটকিগুলো পরপর মিশে কেমন একটা থ্যাবড়া লাল ছোপ জাগে।

পাছার চুলকানি পুঁজ আর রসে জাগ ধরে উঠেছে। পাশ ফিরতে ফেটে গ্যালো। দপ্‌দপ্‌ করে টাটাচ্ছে এখন। মিলে স্পিনিং মেশিনের হাতল টানতে, যন্তর নিয়ে লড়তে গিয়ে কেটে-ওয়ার হয়ে গ্যাছে কতবার। দু'দিন না যেতেই মিলিয়ে যেত। পুলিশের ভ্যাটকা মুখ পিস্তির মতো চুলকানির চেয়ে তার ভোগান্তি ঢের কম। দুসরা গিন্‌তি এসে গেল। মহারাজ জমাদার। পায়ের শব্দেই আঁচ করল। মঙ্গলের কান দুটো তুখোর হচ্ছে দিন দিন।

—এ···বাহার নিক্‌লো···।

দোসরা গিনতি এসে গ্যাছে। মঙ্গল লাফ দিয়ে উঠল। পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হবে এখন। ফাইলে দাঁড়িয়ে বিজু ফিস ফিস করে গত রাতের স্বপ্নটা আধো আধো বলবে: দেখলুম কত মানুষ···লাখ লাখ···গেটটা উপড়ে ফেলছে, পাঁচিলটা বিদ্যুতের কড়াৎ কড়াৎ শব্দে ভেঙ্গে দুখান···ভীষণ লড়াই··· বিজু রোজই এক স্বপ্ন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। কমসেকম দু'বার মহারাজ সেপাই গিনতি্তে গলতি করবে। রামচন্দর মেট সব বাতলে দেয়। ফালি কাগজের ছোট্ট খাতা খুলে জমাদার হিসেব করল। পেনসিলটা গোঁফে ঠেকিয়ে। শেষে মুদির মতো ডিউটি সেপাই আর মেটকে সমঝে দিল: তব্‌ চাল্লিশ রহা।

পাশের সেলের মহিমই কথাটা বলল। পাঁচিল নাকি আরও এক হাত উঠবে। আই, জি, বলে গ্যাছে। মোলাকাতের মওকায় সেলের বাইরে গেছিল মহিম। তখনই জানতে পারে। জেলারের পাকা আতার মতো মুখখানা নাকি ভয়ডরে ফেটে যাচ্ছে।

—হঠাৎ!

—কি সব খবর আছে নাকি !

—ও।

—এবারে আকাশটাও জেলে পুরবে।

কানাপোকা ছোলার নাসতা ডালায় চেপে এল ! পেটের জ্বালায় সব তাই চিবোবে। আবার থু থু করে দেয়ালে ছিটিয়ে দেবে। সুবলা সবটাই মেরে দেয়। ছেলেটার ধাত কড়া। মঙ্গলের নাম গলতি করে একবার রাইটার ডেকেছিল। সুবলারও মোলকাত। খাঁচার জালে আঙুল ছড়িয়ে বুড়ো বাপকে বলল : জেল তো আমাদের জন্য ইউনিভার্সিটি। মঙ্গলের মোলাকাত হয়নি। বুঁচি আসেনি। কি যে হল বৌটার। মরে হেঁজে গেলেই বা কে খোঁজ করছে। বচ্ছর পূরতে চলল।

ডাণ্ডাবেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলে মাষ্টার ঘষটে ঘষটে পায়চারী করছিল। সুবলা তখনও পাঁচিলটায় ঠেস দিয়ে বসে আছে। মাষ্টার জলদি পা টেনে টেনে সামনে এল। চুরুটের পোড়া দাগটা কাঁপিয়ে মুখে হাসির ছোপ ফুটে উঠল।

—চোখ কেমন ?

—কি জানি।

—আবছা দেখছো ?

—হুঁ।

—দেখতে পাচ্ছো তো ?

—একটু একটু পাই এখনও।

মঙ্গলের মুখটা দু হাতের থাবায় শক্ত করে ধরে মাষ্টার মুখের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মঙ্গলের চোখের মনিতে মাষ্টারের গালের শ্বেতির মতো দগদগে পোড়া দাগটা ভাসছে। দাগটা ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। গরম নিশ্বাস পড়ছে মঙ্গলের কপালে, গালে। মাষ্টারের বুকের ধুক ধুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে মঙ্গল। আর মঙ্গলের ভ্যাপসা চোখ দুটোয় অজস্র সূক্ষ্ম শিরা আর আঁশের মতো সাদা ডিম দেখতে দেখতে মাষ্টারের চোয়ালের হাড় ঠেলে ওঠে।

রাগে শুখ্‌নো ঢোঁক গেলে—শিশির মাড়াতে পারলে—। মানুষটা তখনও হাঁফাচ্ছে।

—শিশির!

—হুঁ।

মঙ্গল ফের মাথাটা পাঁচিলে কাত করে দিল। ঠ্যাং দুটো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিল। কানের কাছে বিড়িটা ঘুরিয়ে আগুনের ধান্ধায় চারদিকে চোখ ঘোরায়। আর মাষ্টার মাথাটা শানের দিকে ঝুঁকিয়ে ডাণ্ডাবেড়ি ঘষটে সিধে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। স্কুলের ছেলে চোদ্দ বছরের বিজু সাথ দিল। ফিসফিস করে ঘাড় নেড়ে কি সব বলে চলল। বোধহয় গত রাতের স্বপ্নের কথা। শোনা যাচ্ছে না। সেরেফ বিজুর ঘন ঘন হাত নাড়া আর দু একটা ছেটকানো কথা থেকে মঙ্গল আন্দাজ করল তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। লঙ্কা বাটার ছ্যানছেনে জ্বলুনি আসে কথা শুনলে: পায়ের তলা ডাণ্ডা দিয়ে ফেঁড়ে ফেলেছিল। হাজার নিংড়ানিতেও কথা বের করতে পারেনি। পা ফুলে ঢোল হল। সেঁকা রুটির মতো। তাতেই তো চোখটা…।

সেলের কোনে স্ববলা ছিপিয়ে চা বানাচ্ছে। লাল চা। এখন আধা ঘণ্টা ছাড়। তারপর মহারাজ জমাদার ফের বেঁকা লাঠি ঠুকে ছ্যাঁচড়ে আসবে। ছ্যাঁচড়ানির বিচ্ছিরি একটা প্রতিধ্বনি জাগবে পাঁচিলে ঠিকরে। মঙ্গল টিনের মগটা আগিয়ে ধরে জুলুজুলু চোখে স্ববলার দিকে তাকিয়ে আছে। স্ববলা তেড়িয়াভাবে ঘাড় নাড়ল: চা খাওয়া বারণ না তোমার! শেষে মায়া হল, খানিকটা ঢেলে দিল: মরগে আমার কি! ফুরফুর করে ঘুরে ঘুরে ঘুরে চা খাচ্ছে মঙ্গল। আর মাষ্টার চোখ বুজিয়ে গান ধরেছে: লাখো লাখো করতাল, হরতাল হেঁকেছে…হরতাল…। সেপাই মুখ খারাপ করতে গেলে, স্ববলা হুমকি দিল: হুঁশিয়ার!

মঙ্গল আবার পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসেছে। মনটা উথাল পাথাল হলেই ও পাঁচিলে ঠেস দিয়ে বসে। মাথার চাঁদিতে গোল করে রোদ পড়েছে। মহিম এসে হাত ধরে টানল: ওঠ। স্ববলার সেলের সামনে টেনে নিয়ে গেল। পা মেলে ছড়িয়ে বসেছে সব। আর খসখস করে ঠ্যাং চুলকোয়। এখনও কাগজ

আসেনি, তাই সব উড়ু উড়ু। কাগজ আসামাত্তর মৌমাছির মতো চাক ধরে উঠবে সব। কাস্তের ধার নামবে চোখের তারায়।

—আলিপুর জেলে আবার পিটিয়েছে!

—এই ছ্যাখ সুবলা, দক্ষিণ রেলে ধর্মঘট!

—সাবাস! সাবাস মজদুর ভাই!

তরতাজা সব্জীর মতো টাটকা গন্ধ নিয়ে কাগজ আসেনি এখনও। আজ সব আনচান করছে তাই। ওদিকে খাঁচায় পোরার সময় হয়ে এল। দেড় ঠেঙে জমাদার পেতলের চাবির গোছা নাকের কাছে নাড়ছে। একটু বাদেই মেটকে সাথে নিয়ে তল্লাশী চালাবে। মোলাকাতের লেবুটা এই মওকায় ঢোলা পকেটে চালান করে দেবে। সিগারেট হাতানোর ধান্ধা করবে। লণ্ডভণ্ড করে ফ্যালে আজব সংসার। সুবলা মঙ্গলের দিকে ঘেঁষে এল। চার তরফে চোখের মনি ঘোরাচ্ছে। কিছুতেই মঙ্গলের মুখের দিকে চাইতে পারে না। নটার সিটি ফুঁকে দিল। মহিম সেপাইকে ছিপিয়ে একটা বই নিয়ে চট করে সেলে ঢুকে পড়ল।

—মাষ্টারদা বলছিল···।

—কি?

—সবুজ গাছপালার দিকে তোমার তাকানো উচিত।

—আর?

—আর কি!

—শিশির মাড়ানো?

সুবলার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে মাড়িতে জড়িয়ে থাকে। কথা সরে না মুখে। শুধু জ্বলে। গোটা শরীরটা জ্বলে। ওদিকে মঙ্গল ঠোঁট ঝুলিয়ে একটু হেসে, গড় গড় করে বলে চলল: গাছের পাতার সবুজ রঙে এমন একটা জিনিষ আছে, যা রোজ দেখলে চোখের পুষ্টি হয়······আর শিশির হল······।

সুবলা চুপ মেরে গ্যাছে। আর কি ই বা বলার আছে। চোখের সামনে একটা মানুষ······। সুবলার চোখ ছল ছল করে ওঠে। আজকাল ওরা মুখের দিকে তাকাতে পারে না। নিঃসাড়ে বিড়ির রেশন দেয়। ছটা বিড়ি রোজকার

বরাদ্দ। জমাদার বন্ধ করতে করতে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁচড়ানির শব্দ সমেত।

—পাঁচিল নাকি আরো এক হাত উঠবে?

—কে বল্ল?

—মহিমদা।

সুবলা মাথা ঝাঁকিয়ে সেলে ঢুকে গেল। এ লাইনের লাস্টে, মঙ্গলের সেল বন্ধ হবে। আসলে সবাই সেপাই জমাদারকে সমঝে দিয়েছে: লাসট্ যে মঙ্গল। আধা ঘণ্টা কাবার। সেলের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মঙ্গল। মাষ্টারদা সেলে ঢুকেও পায়চারী করে। ডাণ্ডা বেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দটা কানে আসছে। পয়লা বাইশ সেল ঠাণ্ডা। সেপাইর ডাণ্ডা ঠোকার শব্দ ওঠে থেকে থেকে। আজ মেজাজ বিগড়েছে। নাহলে সুবলটা ঠিক চেঁচাত—

—মহিমদা……আ…।

—কি ই…ই—।

—মঙ্গলদাকে গান ধরতে বল।

আজ আর এসব কিছুই নেই। সুবলা হয়ত মাথার খুস্কি টানছে। মঙ্গল উপুর হয়ে শুয়েছিল। এমন সময় ফাঁকা সেলটায় (সেলের সামনে পাঁচিল ঘেঁষে লম্বা শান বাঁধান চত্বরটায়) গরজন সিঙের খনখনে গলা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল। গতবার পাগলীর সময় লোকটা দুজনকে স্রেফ ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। পয়লা বাইশ সেলের বাসিন্দেরা হাতের ফানা কামড়াচ্ছে। মঙ্গল দুবলা চোখ দুটোয় আগুন জ্বেলে সেলের গরাদ ধরে গরজন সিঙের মিলিটারী গোঁফ, আর গোঁফের পাশে নিষ্ঠুর রেখাটা দেখছে। মাষ্টার অস্থিরভাবে পায়চারী করছে। ডাণ্ডা বেড়ির ঘটাং ঘটাং শব্দ পাগলীর ঘন্টির মতো বাজছে। হাতুড়ীর বাড়ীর মতো জোরালো শব্দে সিঁদেল চোর ফালতু এক বস্তা সিমেন্ট এনে ফেলল। পয়লা বাইস সেলটার বুক টিপ্ টিপ্ করছে। হঠাৎ তাদের ফেটে পড়া আশ্চর্য নয়।

পয়লাবাইশ বেজায় শান্ত। চুলকানির খসখস শব্দটা অব্দি বন্ধ হয়ে গেছে। পাগলের মতো সেলের চার হাত জমিতে পায়চারী করতে করতে মাষ্টার গরাদ মুঠো করে ধরেছে এক সময়। আর তখন ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বালির বস্তা আসতে লাগল। ঝটপট সি আর পি স্কোয়াড পাঁচিলে মই লাগাচ্ছে দশ হাতে ভারা বেঁধে, কিলবিল করে আট দশ জন মিস্ত্রি চড়ে বসল। হাতুড়ীর ঠক ঠক শব্দে পাঁচিলের ইঁট খসাচ্ছে। খানিক বাদেই ক্ষ্যাপা অশোক গাছটার মাথা গাঢ় সবুজ রঙ্ নিয়ে জেগে উঠল। সুবলা কি বুঝেছে কে জানে, হঠাৎ উল্লাসের সাথে চেঁচিয়ে উঠল : মঙ্গলদা!

—কি?

—দ্যাখো, সবুজ…।

—দেখছি।

—তোমার চোখ সেরে যাবে……।

ততক্ষণে খসানো ইঁট দুটো ফের চাপিয়ে মিস্তিরি করণি বোলাচ্ছে। পয়লা বাইশ গলার কাছে শ্বাস আটকে পাঁচিলটার স্পর্ধা দেখে। মিস্ত্রির ব্রন-বসা মুখখানা ওদের কাছে কুচ্ছিত হয়ে উঠল। সুবলার কথা বন্ধ হয়ে গ্যাছে। লক আপ খুলে দিয়েছে। ছেলেটা সেল থেকে বাইরে এল না। অশোক ফুলের ঢালাই লোহার মতো লাল্ রঙ্টা আর দেখা যাচ্ছে না। বাড়তি এক হাত চড়চড়িয়ে উঠল। পাঁচিলটা ওপরের দিকে ক্রমশঃ কুঁজোর মতো বেঁকে গ্যাছে। মাষ্টার মহারাজ সেপাইকে হাদাগোবা সেজে জিজ্ঞেস করল : পারলে সূর্যটাকেও তেরপল্ দিয়ে ঢেকে দিতে না?

মহারাজ বেঁকা লাঠি ঠুকে ছ্যাচড়ে চলে গেল।

পাঁচিলের কুঁজটা আরেক হাত চড়ল, মিস্ত্রির করণির বুলানি, ফের আরেক হাত…আরেক হাত…।

জান বাঁচাতে মঙ্গল নাড়ী মুচড়ে গুঙরে উঠল। থান ইঁটটা সিধে চাঁদিতে

এসে লেগেছে। প্রথমে ধ্বস নামার শব্দ। তারপর সেপাইর দৌড়ঝাঁপ। আর হুইসিল। পাগলী। সুবলা গোঙানির শব্দ পেয়েই বাইরে ছিটকে এসেছে। মঙ্গল তখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মাথাটা থেঁৎলে গ্যাছে। তবু হুঁশ ছিল। মাথার খুনে কব্জি শুদ্ধ হাত চুবিয়ে মঙ্গল চোখের সামনে আঙুল নাড়ছিল। চোখের ডিম তুবড়ে আসছে। মুখে ছুরির ফিনফিনে ডগায় টানা কাটাকাটা দাগ ফুটছে।

—দেখতে পাচ্ছোনা!

সুবলার গলার সাথে সাথে শরীরটা কেঁপে উঠল।

মহিম আর মাষ্টার পাগলের মতো মঙ্গলকে জাপটে ধরেছে। চোখমুখ ফেটে পড়ছে। পাগলীর হুঁইসিলের মধ্যে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করছে : মঙ্গল ! মঙ্গল !! মঙ্গল !!

আর সামনে জমাট পাথরের মতো অন্ধকার দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে, শরীরটা বেঁকিয়ে মঙ্গল গলা চিরে ফেলল : আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না !

……তারপর জেলখানায় ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে খানা বদল হয়েছে। এখন কপির ডাঁটা সেদ্ধ দিচ্ছে। আর মঙ্গল শীতের রাতে বাতাসের বাড়ি খায়। তবু কান ঢেকে শোয় না। ও বলে : কান তো নয় অস্তর। অনায়াসে ও এখন সেরেফ পায়ের শব্দেই শত্রু মিত্র টের পায়। মহিম লুকিয়ে ছিপিয়ে কেতাব নিয়ে এলে চিকন শান্ত গলায় বলে : ঐ জায়গাটা পড়োনা ঐ যে পুলিশ মিলিটারী জেলখানা রাষ্ট্র…।

চাঁদের বিয়ে

সাঁওতালগাঁটা এবার নজরে এল। চিম্‌সে পেটের মতো। দড়া পাকিয়ে গ্যাছে। ভুখের টানে শুকোচ্ছে। হর রোজ। একটু একটু করে।

এক নাগাড়ে পা চালিয়ে শিরায় খিঁচ ধরছে। আর ঘাম। নাকের ডগ বেয়ে ফাটা ঠোঁটে টসটসিয়ে পড়ছে। লোনা সোয়াদ লাগে টাগরায়। ঠ্যাং দুটো মাটিতে গেঁথে যাচ্ছিল। আর ক্লান্তিতে কেমন নেশা নেশা লাগছে। হাতের চেটো দিয়ে জবজবে ঘাম পুঁছে ফেললাম চোখের পাতা থেকে। তীরের ফলার মতো দৃষ্টি দিয়ে গাঁওটাকে বিঁধে ফেলতে চেষ্টা করছি।

—এই সিধে, সামনে একটা নদী পড়বে।

—আপনি ডেরা অব্দি যাবেন না ?

—নাহ্, কমরেড।

—আচ্ছা।

— খোঁজ নেবেন তো চান্দুয়ার বিয়ে কবে।

—আ চ্ ছা (হঠাৎ আপসে হাসি এল আমার)।

পোঁটলাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিল। পুরু ঠোঁটটা হাসি চাপতে গিয়ে কেমন বেঁকে গেল। হনহনিয়ে বাঁ তরফের পথ ধরে হাঁটা ধরল। আরো পাঁচ

মাইল হেঁটে নমশূদ্রের গাঁয়ে যাবে। একটু আগেই আমার সঙ্গী দুসরা রাস্তায় যাবে ভেবে বুকের ভেতর মোচড় দিচ্ছিল। আর মানুষটা যখন সত্যিই চলে গ্যালো, টেরও পেলুম না।

দু দশ পা আগে-পিছে ডোবা আর নাবাল জমিন। ঝোপ ঝাড় শিয়ালকাঁটা মাড়িয়ে চলেছি। ঢালাই লোহার মতো রোদ গলছে আশমান বেয়ে। মাটি শুঁষে রস টেনে নিচ্ছে আশমানের মালিক। বুনো ঘাস তামার বর্ণ হয়ে গ্যাছে। চিড় ধরছে মাটিতে। চরচরিয়ে ফেটে ঘা হয়ে যাচ্ছে। রেললাইনের অগল বগলে বাদিয়ারা চাষ দিয়েছে। ওপার থেকে ঝেঁটিয়ে আসা রেফিউজী। পূর্ণিয়ার ক্ষেতি কাম করে খাওয়া পুরোন বাসিন্দেরা বলে, বাদিয়া। অসুরের তাগত ধরে গতরে। সেই বাদিয়ারা অব্দি বলছে: ই বচ্ছর আর মাইনষে বাঁচতে পারবো না! কথাটা যেন হলদে ছোপ ধরা খটখটে হাড়ের মতো মাঠ পেরিয়ে হু হু করে ছুটে আসছে। হাত পা গজিয়ে পেছু তাড়া করছে।—মাইনষে বাঁচতে পারবো না!

মাটি থেকেও আগুনের হলকা ছুটছে। পৃথিবীটা যেন মাথার চাঁদির মতো ফট্ করে ফেটে যাবে। যখন কুত্তার মতো জিভ ঝুলিয়ে শ্বাস টানতে হচ্ছিল তখন সেই নদীটা পেলাম। ঢ্যাঙা মতো এক মাঝি থির জলে লগি ঠেলে পার করে দিল।

টোলাগুলো এক এক করে জেগে উঠছে। ঝুপরি থেকে দু একটা মানুষ ঘাড় ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে। যেন মাটি ফুঁড়ে জাগছে। দু একটা বালবাচ্ছা ন্যাংটো হয়ে মাটি গিলছে। নয়া আদমী দেখে লেড়ী কুত্তার দল ঝেঁটিয়ে এল। চিল্লিয়ে মাথার উকুন খসিয়ে দিচ্ছে। গরীবগরবার বেসাতি আর শুকনো ছিবড়ে মাঠ। মাঝে মধ্যে আশমানের দিকে বল্লমের খোঁচার মতো উঁচিয়ে আছে দেবদারু। সাঁঝ লাগছে। মাজাভাঙ্গা এক বুড়ী একহাতে গোবরের নাদি,

আরেক হাতে খড়কুটো নিয়ে, কোদালের মতো দাঁত নেড়ে খিস্তি করতে করতে ডোবার দিকে চলেছে। মুখে আঁকিবুকি। খিস্তির চোটে মুখের কাটাকুটি মিহিন দাগগুলো যন্ত্রণায় ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে। সাঁঝের লাল ক্ষীণ একটা আভা বুড়ীর বঁড়শীর মতো বেঁকা নাকের ডগে পড়ে চিকচিক করছে।

—চন্দ্রশেখর কা ডেরা মালুম?
—কে কার ছে?
—চন্দর শেখর?
—চানতুয়া?
—হ্যাঁ।
—হামার বেটা ছে।

হাজায় খাওয়া পাঁচ পাঁচটা আঙুল হাড্ডিসার বুকের টান ধরা চামড়ায় ঝট করে বিছিয়ে দিল।

এর মানে সে মা। কেমন একটা গর্ব এল। ভাঙা মাজা সিধে করে হাঁটতে কোঁত পেড়ে উঠল। গজগজ করে চলেছে আপন মনে। আর ভাঙা মাজা ছ্যাঁচড়ে চার হাত পায়ে হাঁটতে লাগল। গুঁড়ি মেরে। মাঝে মধ্যে আমায় পুঁছনাছ করছে। কোথাকার মানুষ? বেটার দোস্ত নাকি? আবার ছেলের কথা বলে। মায়েরা এইরকম, ছেলের কথা বলতে শুরু করলে আর জিরেন নেই।

...সাঁঝ গেলে বাতি, আর বয়েস গেলে সাদী। এখন দিব্য মদ্দ হয়ে উঠেছে। বিয়ে সাদী না করলে চলে? তা কে ড্যাকরাটাকে বোঝায়! কোথায় জোয়ান বৌটা এসে ডেরায় চিত্তির দেবে...কপাল।

আমার আলজিব অব্দি শুকিয়ে খরখর করছে। এক ফোঁটা পানি দিয়ে বুকটা শেতল করতে হবে আগে। ডেরার কাছে এসে বুড়ী গাল ভেঙে হাসল। ডেরার চালায় স্যাতা শন। নুয়ে পড়ে মাটিতে আঁচড় দিচ্ছে। বাতা থেকে পাকা বাঁশের খুঁটি বেঁধে ঠেক্না দিয়েছিল কোনকালে। ঝড়বাদলার ঝাপটদাপট হজম

করে ঘুন খেঁদিয়ে কোন রকমে টি'কে ছিল। গেল সনে জমিনের ঝঞ্ঝাটে সেই যে পুলিস এসে লাথ মেরে শুইয়ে দিয়ে গ্যাছে, আর দাঁড়া করায়নি। বুড়ী হাতের পাঞ্জা নেড়ে এসব গল্প বলে আর ছেলের মনের গতিক বাত্লায়। খানিকটা নাড়া বিছিয়ে বসতে দিয়েছে। উত্তর দেশের মানুষজন অতিথির যত্ন আত্তিতে কক্ষনো গলতি করে না। ততক্ষণে এক লোটা পানি ঢকঢকিয়ে গিলেছি। আমার সঙ্গী কমরেডটি বলেছিল: চানদুয়া পাক্কা আদমী। গাঁওটা ওর কথা মানে আর তেমনি জঙ্গী। বুড়ী আবার বিড়বিড় করে জানাল—ড্যাকরাটার ঘরে টান নেই। হা কপাল, বৌটা আসলে দেখতুম!

•

সাঁঝ লাগতে ফিরল। কোমরে ন্যাতার মতো একফালি কাপড জড়ানো। হাঁসুয়ার ডগায় বুনো ঘাসের গোড়া লেপটে আছে। বুকখানায় মাংস দাঁড়াতে পারেনি কোথাও। চিতিয়ে আছে। ঝডঝাপটা ধকল রুখে মজবুত। এতো ঘষটানি আর টানাহ্যাঁচড়ায় লোমগাছাও গজাবার ফুরসত পায়নি। মুখে বিচিত্র কিছু নেই; চাপা মোটা নাক, পিটপিটে চোখে হাঁসুয়ার সান। হাসিটা জব্বর, ধবধবে সাদা।

—রাজু ভেজা?

—হ্যাঁ।

ফ্যানমারা খুঁদভাত আর গুগ্‌লীভাজা। আহা দিব্য! পেটের টানে সাপটে খেলাম। উদ্‌গার উঠল। রাতে ছাওয়ায় টান টান হয়ে পড়লাম দুজনে। ও আমায় পুঁছনাছ করতে লাগল। মুলুক কোথায়? অগল বগলের গাঁ কেমন তৈয়ার নিচ্ছে?

চুঠার ধোঁয়ায় অমাবস্থার আনধার গাঢ় হচ্ছে। চানদুয়া রসিয়ে কথা বলে। একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে বেবাক জিনিষ। ততক্ষণে আমি ওকে চানদুয়া বলেই ডাকতে শুরু করেছি।

…বাপ ঠাকুর্দ্দা জঙ্গল সাফ করে কুপিয়ে জমি বানাল। দখল বর্ত্তায়নি তবু…। হাড়ে দুর্ব্বো গজিয়ে চোখের সাদা ডিম উল্টে দিয়েছে এক সময়। লড়ে জান কয়লা করে দিয়েছে তবু বাঁচতে পারেনি। গেল সনের কথা, রাক্ষুসী কুশী জমিন কাটতে লাগল…পানি সরে যেতে ফের মাটি কুপিয়ে বান্‌ধ দিলাম…লেকিন ?

হাল সব এক কিসিম। আমার দেশের মানুষই যেন মুখ খুলেছে। আমি পূব দেশের মানুষ। আর এটা উত্তর। বিলকুল এক হাল। বাদিয়ার কথাটা মনে পড়ে যায়—মাইনষে বাঁচতে পারবো না। মুখ ফস্‌কে বেড়িয়ে গেল কথাটা।

—তাজ্জব বাত !

— কাহে ?

—তো কোন জীয়েগা ?

—কৌন ?

—জানোয়ার ?

—নেহী।

—তব !

—ইনকিলাবী জনতা।

ওর বুকের ওপর আমার হাতটা রয়েছে, পাঞ্জা শুদ্ধু। চানতুয়া গেল সনের জমিন বাঁটিয়ারার কথা বলছিল। এই গাঁওটা নাকি সেই থেকে তৈয়ার আছে। এমনিতে বোঝার যো নেই। কিন্তু হাঁক দিলেই নাকি বন্নার মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটবে। জোতদার মহাজন রামদয়াল তিনটে পাঁইট ফেলে পালিয়ে ছিল। গেল সনে। একটার ঠোঁটের কষ ফেঁড়ে দিয়েছিল গাঁওয়ালে। ভালার খোঁচায়। গেল সনে পুলিশ নিয়ে আঁাগ লাগাতে এসেছিল দোকলার দল।

চানতুয়া গান ধরেছে। গলা কাঁপিয়ে গাইছে। মোরগ ডাকার একটু আগে

নিঁদ লাগল। গানের শেষ লাইনতুটো ঘুমের ঘোরেও কানে বাজতে লাগল :

আব তু হো যায়েগা ঠাণ্ডা

ও তে রাঙ্গা ঝাণ্ডা।

শেষে তুজনেই বেহুঁশভাবে নিঁদে ঢলে পড়লাম। গানের কলিটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে দাওয়ার ওপর ঝুঁকে নামা শন হাত দিয়ে ছুঁলাম। মনের ভেতর কেমন একটা বিশ্বাস গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে : মানুষটা জিন্দেগীতে ডেরা বাঁধবে না। যদ্দিন বুড়ী আছে, ব্যাস।

কুসুমের মতো ভোরের রোদ পিঠ ছুঁয়ে দিচ্ছে। আলগোছে। গাঙের মাটি দিয়ে কাচা নীল ফতুয়া পড়েছে চানতুয়া। আনধার কাটার আগেই রওনা দিয়েছি। চানতুয়ার পোঁটলার ভেতর থেকে মুরগীটা ডেকে উঠল। চানতুয়া মুরগীটার ঘেয়ো মাথায় থাবড়াতে লাগল। ওদের জাতে নাকি এতো জলদি কেউ মরে না। ওর এক দাতু আছে ছিয়ানব্বই বছর বয়স। এখনও বীজ বোনার আগে জমিন বানায়, জলকাদার কাজ সারে। পুরোন কথা কিস্‌সা বলে। আসলে গেল সনে জমিনের জন্যে লড়তে গিয়ে চোট লেগেছিল চানতুয়ার শ্বশুরের। সেই কাল হল। বচ্ছর ফিরতে পেলনা। আজ সারহাদ্। শ্রাদ্ধ।

জলোজমি আর ক্ষেতের আল ধরে তুজনে চলেছি। চানতুয়ার মেজাজ রাতের থেকেও সাফ। ফুরফুরে। শ্বশুরের গল্প করছে। আমার কেমন মজা লাগছিল—না বিইয়ে যশোদার মা। ওদের এই রীতি, ছেলেমেয়ে তুজনের মনে রঙ ধরলেই ব্যাস। গাঁওয়ালে জানতে পারলে' ক্ষেতি নেই। তবে চানতুয়ার মাকে নিয়ে ওর বাপ বিপদে পড়েছিল। টেনে তো নিয়ে এল। আর যায় কোথায়! মেয়ের বাপ জ্ঞাতি কুটুম সব ভালা নিয়ে ছুটল। তিন রাত্রির জঙ্গলে জঙ্গলে পালিয়েছিল। মাচান বেঁধে গাছে থাকত।

—তুমারা কেয়া বাত ?

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসতে লাগল চানছুয়া।

– নেহী।

মাথার ওপর রোষ ঢালছে আকাশটা। আগুনের তীর ছুটছে। থুতু শুকিয়ে ঠোঁটের লাগামে জমেছে। একটা শিমূলের হালকা ছায়ায় বসে পড়লাম। পোঁটলা খুলে চানছুয়া রুটি বের করল একটা। আধাআধি তাই খেয়ে, পানি গিললাম ছুজনে। আবার হাঁটা ধরলাম।

হঠাৎ জমিন ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। টিঁপিটার ওপর চড়তেই নজরে এল একদল সাঁওতাল মেয়ে মাথায় করে বাসি ফুলের ডালা আরও কি সব ন্যাকড়া-কানি থরা নদীর পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে ফিরছে। ওরা গান গাইছিল সুর করে কান্নার মতো। আর রূপোলী চুল খোপনা করে বাঁধা এক বুড়ী, বুক চাপড়ে কানছে।

—আম্মা!

চানছুয়ার গলা ভিজে গ্যাছে। গোবড ল্যাপা খড়ি দিয়ে চিত্তির বিচিত্তির ডেরাগুলো জেগে উঠল। টোলার বুক ফেঁড়ে ভালার মতো পথটা সিধে চলে গ্যাছে।

উঠোনে পা দিতেই একটা খাটিয়া পড়ল। যুবতী মেয়েরা চানছুয়া আর আমার পা ধুইয়ে দিচ্ছে। যত্ন করে কাদা আর মরা ঘাস তুলে ফেলছে। মেয়েরা খিলখিল করে হাসছে। আর বয়স্কদের মুখে কেমন একটা উদাস ভাব। পা ধুইয়ে দিলে চানছুয়া ছোট মেয়েটার হাতে পয়সা দিল। সে এখনও যুবতী হয়নি। কিন্তু চোখের তারায় লাজ নেমেছে।

সারারাত ধরে সারহাদ চলল। চানছুয়ার বড় শালা একবার মোরগ একবার হাঁস ছু হাতের থাবায় নিয়ে বসছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়া ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছিল জীবটার মাথায়। তারপর বলি হয়ে যায়। জমিনে খুনের রঙ ধরছে। ওরা

বলে, মানুষ যখন জন্মায় তখনও রক্ত ঝরে। তাই সারহাদেও এই ব্যবস্থা। এমন একটা মানুস আছে যার খুন নেই? এমন একটা কাম আছে যাতে খুন ঝরে না?

না, নেই।

উন্ নামল বেক্সায়। রাত গাঢ় হচ্ছে, উন্ বাড়ছে। চানদুয়া হাড়িয়া টেনে চোখ রাঙিয়েছে। আমিও এক পাত্তর টেনেছি। ঝাঁজ আছে বটে! গলার নলী পুড়িয়ে দিল। কাজ কাম সেরে ও পাশে এসে বসেছে। আমার মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে, মরদটা বোধহয় বিয়েসাদীর রাস্তা মাড়াবেনা। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে এককাট্টা করছে, সাদী করলে কি সময় পাবে! কালই রাজুর সাথে ভেট হবে। কি জবাব দেবো? আগুনের কুণ্ড জ্বলছে একটা। জবাই করা জানোয়ার ঝলসানো হচ্ছে।

—সাদী করনা ঠিক নেহী।

কথাটা আমি নেশার ঝোঁকে বললাম।

—কাঁহে?

—লড়না মুশীব্বত হো যাতা···।

—গলদ বাত।

চানদুয়া পুরানা জামানার গল্প জুড়তে বসল। ওদের গোত্রের আদি পুরুষ বলেছে—বিয়ে সাদী না করলে তপস্যায় সাফল্য আসে না। মেয়ে আর মরদ এই দুই নিয়েই দুনিয়া। জঙ্গলা কেটে আবাদ করে ডেরা তুলেছে দুজনে। বাল-বাচ্ছার জন্ম দিয়েছে। জন্তু আর তুফানের সাথে লড়েছে। কাকে বাদ দেবে তুমি?

যে মেয়েটা পা ধুইয়ে দিয়েছিল, সে সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে। চানদুয়া মেয়েটার সাথে ডেরার ভেতর ঢুকল।

সে রাতে আর ঘুম হল না। চানদুয়া বলল কদিন ঘুরে আসতে। সারহাদ

মিটলে, ওর গাঁয়ে এসে থাকতে হবে। এর মধ্যে অগলবগলের গাঁগুলোকে ও সানিয়ে নেবে। এক মাহিনা লাগবে। মরদরা সব নাকি দাঁতে দাঁত দিয়ে আছে।

উষ্ মাথায় নিয়ে আমি চলেছি। এক মাহিনা বাদ ফের আসতে হবে। গাঁওটা লড়ার জন্য হেঁদিয়ে মরছে। চানতুয়ার কথা আমার মনে হল। কই নিজের বিয়ে সাদীর কথা তো কিছুই বলল না। সাঁওতাল টোলার বাঁকটা ঘোরার মুখে মিহিন গলায় কে যেন ডাকতে লাগল— এ···এ···এ···। এ সেই মেয়ে যে চানতুয়াকে ডেরায় ডেকে নিয়ে গেছিল। মিটি মিটি হাসছে। চোখের গাঢ় মনিতে কথা ফোটাতে চাইল। ওর হিন্দি আসে না। ওর হাত থেকে পোঁটলাটা নিলাম। একটু দাঁড়িয়ে দুজনেই হাসলাম। তারপর হাঁটা ধরলাম। মেয়েটাকেও জিজ্ঞেস করা হলনা। পুঁছনাছ করলে হয়তো মুখটা লাল হয়ে যেত খুনে।

কপিলের মুলুকযাত্রা

ভারতিয়ার কপিল। বৌ-খেকো কপিল। তিনকুলে তার আপনজন বলতে আছে আটার দলার মতো এক নানী। তাও মুলুক থেকে সমাচার এসেছে গেল হপ্তায়, সে বুড়ী নাকি গুয়ে-মুতে ল্যাবড়ে-থ্যাবড়ে আছে। বুড়ী বিদেয় হলে কপিলের অতীতটুকু টিকটিকির ল্যাজের মতো নিঃসাড়ে খসে যাবে। তখন আপনি আর কোপনি সম্বল। তখন কপিল শুধু ভারতিয়া কোম্পানীর বিশ সালের গোঁয়ার ওয়ারকার। যার সম্বল বলতে বুক পকেটের ফটোক, ঝাকড়ামাথা হাড্ডিসার বট গাছটার তামার বর্ণ কচি পাতা ছোঁওয়া টানা আট-চালা বস্তীটি। বস্তীর একখানা খোপ। খাটিয়া। আর খটমল।

আসল বিতান্ত ফটোকের। নিউ এ্যালেনবেরীর লাগাতার পেটশুখা হর-তালের রুক্ষ মেজাজের ভেতর, উবু হয়ে বসে চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে কপিল ফটোখানা বের করে মোলায়েম চোখ বুলোয়। নাড়া লাগিয়ে গলা ভেঙ্গে কেলে মণ্টু ফ্যাস ফ্যাস করে বলে : কপিল, ও কিসের ফটো ?

: ফটোক হ্যায় ফটোক।

: আরে বাপ্ কার ফটো দেখিনা !

: রাম লছমন কা।

বুক পকেটে থাকে ফটোটা। পাতলা প্ল্যাষ্টিকের খামের গায়ে ঘাম-বসা নুনদাগ ফটোটায়ও লেগেছে। ভারতিয়ার বয়লারম্যান কপিল যখন লোহার ঢাঁউশ পেটটার ভেতর বেলচায় করে কয়লা ফ্যাকে আর গতর বেয়ে ফিনকি দিয়ে ঘাম ছোটে, ফটোটা তখনও বুকের কাছে থাকে। কপিলের মাস মাইনের মেহনতের পয়সা আর টুকিটাকি দশটা জরুরী কাগজের সাথে ফটোটা ওর কাছে

দশ বচ্ছর যাবৎ আছে। দশ বচ্ছর! চাট্টিখানি কথা নয়, এখন তো চুলের গোড়ায় চাঁদের রূপোলী ধাতু গলে গলে লেগেছে। আর তখন ছিল মিশকালো চুল। পুলিশের হুলিয়া নিয়ে মানুষটা কপিলের ডেরায় উঠেছিল। আনজান আদমী দেখে 'বহু'র সরম লেগেছিল। আর কপিলের চাউনিতে সে সরম বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেছিল। আর তারপর ভাজি রোটি দাল সবই বানিয়েছে। মানুষটাও কমতি নয়, দুচার রোজেই বহুর দাদা বনে গেল সাচমুচ। ডেরার ভেতর একটা পাতিল কিনে রেখেছিল কপিল। সেই পাতিলেই লোকটা হাগা মোতা সারত, ডিউটি যাবার আগে কপিল পাতিলটা নিয়ে চ্যান করতে ছুটত। অথচ মানুষটার নাম ধাম জানতো না। সনৎদা সাথে করে এনে বলেছিল: কপিল ভেইয়া, এ সাথীকে কদিন রাখতে হবে। হাওড়ার ঐ জুটমিল ওয়ারকারদের ষ্ট্রাইকের পর যে গুলি-গালা চলল না···; পুলিশ খুঁজছে।' কপিল আর পুঁছনাছ করেনি। জরুরতও হয়নি। মানুষটা ওয়ারকারের ভালাইর জন্যে লড়ছে, ব্যাস। সনৎদাকে কপিল কি বলেছিল এখন আর মনে নেই। মনে আছে লড়াকু মানুষটা তারপর মাহিনভর খাটিয়াটা দখল করেছিল। আর যাওয়ার আগের দিন কপিলকে একটা ফটোক দিয়েছিল। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে কপিলের পিঠে আলতো চাপর মেরে বলেছিল: ইয়ে লেনিন, আর ইয়ে হ্যায় স্তালিন।

তারপর কোথায় যে মানুষটা হারিয়ে গেল। কপিল ভারতিয়ার ধুয়ো-ধুলো-তেল-কালিমাখা রাস্তার ধারের চায়ের ঝাঁপতোলা দোকানের বেঞ্চে বসে কাকদ্বীপের শাঁখের শব্দ শুনেছিল। লড়াইর সম্বাদ কাকের মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফিটার মিস্ত্রী পঞ্চাকে ডেকে এনে কপিল দু ভাঁড় চায়ের কথা বলে মুচকি মুচকি হাসত। পঞ্চার দড়কচা মুখের দিকে চেয়ে হাসত। পঞ্চা ওর রকম-সকম দেখে বিগড়ে যেত: আরে শালা হাসছিস কেন? এ্যাসেনবেরীর সুদর্শনের মুখখানাও বেঁকে তুবড়ে একসা হোত: কা রে? বোল কা বোলেগা? আর কপিল মুখ টিপে টিপে হাসত। শেষকালে ওরা রেগে হুট করে উঠে দাঁড়ালে জামার খুঁট ধরে জবরদস্তি টেনে বসাত: দেখা কা হ্যায়?

: কা?

: ফটোক।

: তো ক্যা ?

: ইয়ে দেখ্, ইয়ে হ্যায় লেনিন, আর ইয়ে হ্যায় এসতালিন।

দুতিন দফা এমনি হতেই ব্যাপারটা ধর্মঘটের মতো চাউর হয়ে গেল। আর সেই থেকে কপিলের নামটা চাউর হয়ে গেল। ভারতিয়ার কপিল। মুচকি হাসি আর কপিল। বিহারের খরায় পোড়া চোখ দুটোয় তবু লোহার বাবরির মতো ফুল ফোটে : লেনিন কেয়া কিয়া ? এসতালিন কৌন থা ? সনৎদা লেবার কোর্টের ফাইল ঘাটতে ঘাটতে আনমনে বলত : লেনিন ছিলেন ভারতবর্ষের··· খুড়ী···রাশিয়ার কমিউনিষ্ট নেতা···বীর···শিক্ষক।

: এসতালিন ?

: স্তালিন ছিলেন লেনিনের···সহকর্মী কমিউনিষ্ট···লেনিনের ডান হাত।

: ডাহিনা বাজু ?

: হ্যাঁ।

: তব তো উলোগ রামলছমন থা।

রোদে জলা বিহারের চোখ ফটোর মানুষ দুটোর মুখ খুঁটিয়ে দেখে। আঁতি-পাতি করে কি যেন খোঁজে। আচমকা বলে ওঠে : এসতালিনকা এ্যায়সা দেখনেমে হামারা মুলুক মে ভী এক ক্ষেত মজদুর হ্যায়। লেবার কোর্টের কাগজ পত্তরের ভেতর থেকে মাছির মতো চোখ দুটো উঠিয়ে আনে সনৎ : কা পাগল কা মাফিক···।

: নেহী সাচমুচ।

সনৎ-এর মুখে বাঁকা চোরা হাসির একটা রেখা কিলবিল করে উঠতেই কপিল চুপ মেরে যায়। বুক পকেট থেকে ফটোটা বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে : আচ্ছা ও সাথী আওর নেহী আয়গা ? সনৎ এর ঠোঁটে চিবুকে, চোখের খাঁজে 'জানিনা'র উদাসীন রেখা কুটিকুটি করে দেগে বসে। আর কপিল বিড়বিড় করে : ও ভী বহুত আচ্ছা আদমী থা।

ভারতিয়ার গেট ডাহিনা ফেলে, বাঁয়া তরফ চা দুকান। অফিস্পিয়া

ফ্যাকটারীর চা দুকান। ধোঁয়ার জাল। কানের পর্দা ফাটা সিটি। আর পূর্ণিয়া জিলার হাবিবের রুগ্ন বৌ'র নাকফুল দেখতে দেখতে কত দফা মিছিলে হেঁটেছে কপিল। পেট ছিবড়ে করে শুকনো হাড়ে এককাট্টা লাগাতার ষ্ট্রাইকের সময় হাবিবের বৌর নাকফুল বেচতে দেখেছে। আটাগোলা খেয়ে সুদর্শনের ট্যাপাটোপা বৌটা ম'ল। আর বৌটার বুকের দুধ টেনে আড়াই বছরের লাপসালুপসো ছেলেটা। তারপর খাদ্য আন্দোলন। আর হাবিবের উরুতে চোট। কপিল অনেক দেখল। অনেক শুনল। আনকোরার দলকে কপিল এখন রাশিয়ার বাকু অঞ্চলের লড়াই'র গল্প শোনায়। আর বলে: জানতা এসতালিন কোন থা? লেনিন?—নেহী, তো শুন… ।

হঠাৎ একদিন বন্দেল গেটের লেবেল ক্রসিং ছাড়িয়ে সাঁড়াসীর মতো আড়া-আড়ি রাস্তা ধরে ডিউট-ফেরতা কপিলের মাথার ওপর ধোঁয়া আর নিশ্বাসের অফুরান আকাশটা ফালা ফালা হয়ে গেল কুচো মেঘে। পঞ্চা আর সুদর্শন ভারতিয়ার সামনে কাঁচা নর্দ্দমার ওপর বাঁশের মাচান বাঁধা বেঞ্চে চুপ মেরে বসেছিল। সনৎদা ওদের বেওকুফ মুখের দিকে চেয়ে বলল: পার্টি ভাগ হয়ে গ্যাছে। তারপর দেখতে দেখতে যে যার হেডটেল করে একেকদিকে চলে গেল। পঞ্চা আর কপিল কোথাও নাম লেখাল না। দড়ি টানাটানি চলছে ওদের নিয়ে: অলিম্পিয়া কোম্পানীর ঘ্যাস কয়লার ঢিঁবির কাছে সনৎ কপিলের ডাহিনা বাজু চেপে ধরল: কি রে কপিল, কি করবি?

: মুলুক যাবো।

: কেন? নানীর কাছে?

: ন্‌নেহি।

: তব্?

: ফটোক ফাঁড়নে নেহী সকে গা।

: ফটো ছিঁড়তে কে বলেছে?

: তুমলোগ এসতালিনকো মানতা হ্যায়?

: ন্‌ননা। খোদ রাশিয়াই মানছে না।

: হাম ভি রাশিয়া কো মানতা নেহী।

কপিলকে বাগে আনা গেল না। কাঠ গোঁয়ার কপিল। ভারতিয়ার কপিল। বৌ-খেকো কপিল। সনৎ কপিলকে বাগানোর আশাও ছেড়ে দিল : বিহারের হনুমানজী, রাম লছমন সিনায় থাকে ওর।

বিহারের হনুমানজী মুলুক যাওয়ার তোড়জোড় করছে। অথচ মুলুকে ওর জ্ঞাতি কুটুম বলতে ছিল জুবুথুবু এক নানী। সেও চোখ বুজিয়েছে। সুদর্শন আর পঞ্চার সাথে ভেট করল কপিল। মুখে সেই টেপা হাসি।

: নানীর তবিয়ত খারাপ ?

: নেহী। ও তো মর গিয়া।

: তবে যাচ্ছিস কোন চুলোয় ?

: মুলুক।

: মুলুকে আছেটা কে ?

: হ্যায় কোই।

কপিল মুচকি মুচকি হাসে। সুদর্শনের শুঁয়োপোকার মত ভুরু কুঁকড়ে প্রকাণ্ড নাকটা ছুঁয়ে দিচ্ছিল আরেকটু হলে। আর কপিল মজাক করছে। হাসছে। পঞ্চা তেড়িয়া হয়ে উঠল : কে বলবি তো ? কপিল ফের হাসতে থাকে। হঠাৎ বুক পকেট থেকে ছবিখানা বের করে পটগায়কের মতো সুর করে বলে : ইয়ে হ্যায় লেনিন, আর ইয়ে হ্যায় এসতালিন···হাম এসতালিন কো ঢুঁণ্ডনে যা রহা···। বাঁশের মাচানে মচমচ শব্দ তুলে কপিল ওদের কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল : হামারা মুলুক মে এসতালিনকা এ্যায়সা এক আদমী হ্যা···য়···। বিলকুল এসতালিন ক্যা এ্যায়সা ···বড়া বড়া মোচ···।

কপিল মুলুক গ্যাছে দশ বারো সাল হল। গাঁওয়ালে দেশোয়ালে কারো হাত দিয়ে একটা খত পাঠায় নি। দশ বারো সাল মানুষটার পাত্তা নেই।

ভারতিয়ার গেটের সিধে নর্দ্দমার ওপর বাঁশের মাচানে বসে সুদর্শন আর পঞ্চা মাঝে মধ্যেই বলাবলি করে : কবে ফিরবে বল তো ?

—কেন ? তুই কি ভাবছিস !

অলিম্পিয়া কোম্পানীর সিটি আর মজুরের হাসির হররার মধ্যে ওদের দুজনের ভেতর কেউ কপিলের ভালাই কামনা করে। আরেকজন বলে : দেখিস ও ঠিক ফিরবে।

জনম

টিপ টিপ বৃষ্টি। প্যাচপ্যাচে কাদা। থ্যাবড়া থ্যাবড়া পায়ের চেটোয় ছপ ছপ শব্দ তুলে রাখহরি চলল। লম্প'র কালচে শিষটা নেপলার মার নাকের ডগা ছুঁই ছুঁই করছে। বকফুলের মতো নাক। দাওয়ার ঘুনধরা খুঁটি এক হাতে জাপটে নেপলার মা একটু ঝুঁকল—জলদি জলদি এসো। ভাগ্যিস রাখহরি ছিল। অবিশ্যি একটা না একটা মদ্দ থাকতই। বত্রিশটা পরিবার। আর দায় ধকল কার নেই! তাই মরদগুলোর নিশ্চিন্দি। নিশ্চিন্ত মনে তারা কলের ভেঁপু শুনে ছোটে। জানে বেঘোরে মরবে না।

খেদি কাটা ছাগলের মতো দাপাচ্ছিল। ঠোঁট চেপে দাঁতে দাঁত রেখে বেদনা সামলাতে গিয়ে গোঙরাতে লাগল। জন্ম দিতে বড় কষ্ট! দশমাস দশদিনের যাতনা। বেদনা। ব্যথা চাগতে লাগল। ছেঁড়া মাদুরে পোড়া কাঠ পা দুটো ঘষটাতে লাগল খেদি। মানুষটা কাছেপিঠে নেই। জল গড়ান দিয়ে নামল চোখ থেকে। টস, টস, টস। মানুষটা শিয়রে নেই বলে যে কাঁদল তা নয়। এমনকি বেদনার জন্যও নয়। খেদি ভবিষ্যৎ ভেবে কাঁদে। বেদনার ভবিষ্যৎ!

মিহি গলায় দাই কি যেন বলল বিড় বিড় করে। শেষের কথা কটা খেদির কানে গেল—তোর বাপও আমার হাতে হয়েছে। আগের দিনে রোজ নাহলেও তিনটে বাচ্ছা জন্ম নিত। আজকাল মানুষের বাচ্ছাও হয় না। কই গো নেপলার মা, গরম জল হল?

—এই যে মাসী।

ছোট্ট এক চিলতে খুপরি। কাঁচা মাটিতে মাদুর বিছিয়ে খেদির বিছানা। শিয়রে জলের কলসী, ন্যাকড়াকানি। কবাট ভেজিয়ে দিয়েছে নেপলার মা। বাইরে রাখহরি আর জনা দুই মরদ চিন্তিত মুখে বিড়ি ফুঁকছে দাওয়ায় বসে।

—বুড়োদাকে খবর দেয়া দরকার।

—বুড়োদার ফিরতি রাত হবে, সিগকলে লক আউট না।

—ছেলে হইছে ?

—হুঁ।

খেদির এই তিনটি হল। তার আগে তো পেটে থাকতে হাত না গজাতে ম'ল কতকগুলো। তার কি আর হিসেব আছে। জন্মে ম'ল দুটো। এখন সন্তানের গায়ে হাত রেখে খেদি ঘুমোচ্ছে। কিন্তু স্বস্তি কোথায়। খেদির মুখে স্বস্তির চিন্নমাত্তর নেই। ভাবে : বেঁচে বত্‌তে থাকলে আজ তারা কেমন ডাগর ডোগর হোত। খেদির দুঃখের দিন আর থাকত না। মরণের সময় একটু বার্লি পর্যন্ত জোটেনি। খেদি কেঁদে ভাসিয়েছিল। অভাগার সন্তান। জন্মে বাঁচেনা। সোয়ামী বলেছিল : কাঁদিস কেন ?

—মানুষ না, তুমি মানুষ না।

—আজগের জানলি ?

—শরীলে মায়া নেইকো !

—বৃক্ষ বাঁচলে ফল ধরবে।

প্রথমটা ছিল কন্যা। এক মাথা চুল, টানা টানা চোখ। থোরের মত হাত, পা। শাউরী তখনও বেঁচে। বিয়ের মাসেই মেয়েটা পেটে এসেছিল। সেই চোদ্দ বছর বয়সে। সেই গুলি আর লড়াই'র মধ্যে। আজাদীর জন্য দেশটা আঁকপাঁক করছিল। বাঙাল মাষ্টার বলেছিল : এই কন্যা বাঁচলে বিদ্রোহী হইব, দ্যাখোস না এখনই ক্যামন হাত পাও ছোড়ে। মেয়ের গাল টিপে বুড়ো হেসেছিল। চোদ্দ বছর বয়সে খেদি মেয়ের জ্বালা তেমন বুঝে উঠতে পারেনি। শরীরের ধকল সামলাতেই কাহিল। জোয়ান মদ্দ মানুষটা ঝিম মেরে গেছিল। দুঃখের শুখা সংসারে কচি মেয়েটার কলকল হাসি একটা বিরাট সান্ত্বনা ছিল। শাউরী গায়না গাইত। এক কথা হাজার দফা বলত—এলিই বা কেন মা……। পরেরটাও মেয়ে, কন্যা সন্তান। আরেকটু বেশী কালো। তদ্দিনে শাউরী ওষুধ পথ্য বিনে টেঁসে অ্যাছে। সেবারও মানুষটা ঘরে নেই। কাজ নেই, ঠুঁটো হয়ে

বুড়ো তখন ঘরে বসে। বেদনা যখন উঠল, তখন মানুষটা নেই। দুঃখের ধাক্কায় কোথায় গেছিল। কোলকাতা শহরটা হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফোঁপাচ্ছিল। মিলিটিরি বুটের তলায় শহরটা ধুঁকছিল। বুড়ো ফিসফিস করেছিল : তে-লে-ঙ্গা-না। গলির মুখে বুড়োর জন্য অপেক্ষা করছিল খেদি। হঠাৎ বেদনা উঠল। মেয়েটা হবার আগেই তার ডর লেগেছিল। তরাস। দানা নেই, একটাও যে দানা নেই। আটচল্লিশে মেয়েটা জন্মাল। বেড়াল ছানার মতো অবিকল। আটমাসে হয়েছিল বলে চোখ ফোটেনি। মিত্যুর আগে অব্দি মেয়েটার চোখ ফোটেনি।

রাতের দিকে বৃষ্টি জোরসে এল। প্রসূতির গায়ে, ক্ষুদে মানুষটার গায়ে পাছে বৃষ্টি লাগে। রাখহরি, মদনা আর উৎকলবাসী লিঙ্গরাজ খেটেখুটে একটা তেরপল টাঙিয়ে দিল।

—ঠাণ্ডা লাগলে আর রক্ষে নেই।

—সন্তুদের ঘরে অনেক চট আছে, সবজি আনে তো থলেয় করে।

—খান কয়েক নিয়ে আয়না বৌ।

—চাট্টি খড় আনবো দিদি ?

—খড় কি হবে ?

—ওমা !

সব যেন মেতে উঠল। কাশীবাবুর লম্বাটে বস্তীর চালা, বত্রিশ ঘর মানুষ। স্যাঁতসেতে বৃষ্টিতে আঁধার রাতে বত্রিশটা পরিবার চঞ্চল হয়ে উঠল। সিঁদুরের কৌটো ঘেঁটে, শতচ্ছিন্ন সার্টের পকেট হাতড়ে দু দশ পয়সা জমা হল। বুড়োদার কারখানা লক-আউট। তাই বলে তো আর চোখের ওপর মরতে দেওয়া যায় না। তাছাড়া বত্রিশ ঘরের বস্তীটার যেন রোখ চেপে গ্যাছে। মৃত্যুর সাথে যেন তারা পাঞ্জা কষবে।

—রাতভোর দোরগোড়ায় বসে থাকব।

—কি হবে দিদি ?

—আসুক না দেকি যোম।

নুন চা গিলে তৃপ্তিতে চুক চুক করতে করতে কথাটা বলল নেপলার মা।

দিনভোর উপোস মেরে, তারপর প্রসব করে খেদি এখন মরার দাখিল। বয়েসও হয়েছে, চারের ঘরে চল্ল। রক্ত ঝরে ঝরে ফ্যাকাশে মুখ। আর বিয়োনোর ক্ষ্যামতা নেই। দুধ পাউরুটি নিয়ে এল দশ বছরের নেপলা। ছেলেটা ভিজে জবজবে। এখন কাঁপছে। ঠোঁটের কোনে তবু হাসির ভাঁজ। উজ্জ্বল চোখ দুটো চিক চিক করছে কিসের খুশীতে। কিসের খুশী!

হাঁদাল ব্যথা আছে খেদির। বিয়োনোর পর বেদনা জাগে। ফ্যাকাশে মুখখানা বেদনায় নীল হয়ে গ্যাছে। ভোর রাত্তিরের দিকে বুড়ো ফিরল। দোর গোড়ায় ন্যাকড়াকানি জড়িয়ে নেপলার মা শরীর কাত করেছিল। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল সে—কে?

—আমিগো!

—সঙ্গে সব কারা?

—কমরেড। সব কমরেড।

—তা কমরেডরা শোবে নাকি?

—হুঁ।

—ঘরে যে আতুর গো!

রাত ফুরিয়েই এসেছিল। বাদ বাকী তারা গপ্‌পে মেরে দেবে। নানা রঙের গল্প। প্রসূতি এবং শিশু কিছুই জানে না। প্রসবের কষ্টে, হাঁদাল ব্যথার কষ্টে অবশ হয়ে প্রসূতি ঘুমোচ্ছে। আর ছেলেটা ঘুমোচ্ছে জন্মানোর শান্তিতে। বুড়োর দলবল পোঁট্টার সেঁটে এসে, শিশু আর তার জননীকে ঘিরে আনন্দ করছে। আনন্দ।

—মাইরি বলছি বুড়োদা!

—কি?

—ছেলে তোমার সাংঘাতিক হবে।

—মানে?

—খুব জঙ্গী হবে।

—বাঁচলে!

—এটা সত্তোরসাল, বাঁচবে না মানে?

—তা কালও কি লেবার দপ্তরে যাওয়া হবে?

— দুত্তোর !

—তবে ?

—মালিকের বাড়ী ঘেরাও করাই ঠিক ।

অভাবের হা-করা সংসারে থেকেও ছেলেটা সাত তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিতে শিখল। সিগকলে লক-আউট। কিন্তু পেট মানবে কেন ? বত্রিশ ঘরের বস্তীতে দিন চলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হঠাৎ মানুষটা একদিন ঝোড়ো কাগের মতো ডানা ঝাপটাতে লাগল। খেদি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিল।

—কি হল গো ?

—ঘরে থাকা চলবে না আর।

—বলো কি !

—মাথার আচ্ছাদনটুকুও গেল ।

বচ্ছর না ভরতে দিন কাল পালটে যেতে লাগল। তোলা কাজ নিয়েছে খেদি। দামাল ছেলেটা বত্রিশ ঘরের বস্তীতে দাপিয়ে বেড়ায়। খেদির মন তুক তুক করে ছেলের জন্য। সঙ্গে করে আনবে সে উপায় নেই।

—তোর ছেলে বাবা বড্ড কট কট করে চেয়ে থাকে। যেন গিলে ফেলবে।

—আর যা কান্না। ওদিকে কালোকুষ্টি, যেন জঙ্গল থেকে এল।

উকিল গিন্নি নাক কোঁচকান। নাকটা তখন বড়ির মতো হয়ে যায়। ঐ একরত্তি ছেলে বস্তীর প্রাণ। একদণ্ড নেপলার মা কাছ ছাড়া করে না। এরি মধ্যে পা গজিয়েছে। হ্যাঁচড়ে গড়িয়ে গলির মুখে চলে আসে। খেদির বুক পোড়ায়, দিন কাল যা পড়েছে—বাচ্ছা বলে রেহাই পাবে না। এইতো সেদিন জিপ থেকে নামিয়ে জোয়ান ছেলেটাকে গুলি করল। আবার পুলিশের লোকই লাশটা জিপে তুলে দিল। পরের বাড়ী কাজ করতে গিয়ে খেদির মনে সোয়াস্তি নেই। কাজে ভুলচুক হয়। মানুষটার নামে আবার হুলিয়া। বিপদ যেন হাত পা ছড়িয়ে আসছে। সিগকলের লক-আউট নিয়ে কি ঝামেলা, সেই থেকে ফেরার। সার্জেন্ট এসেছিল। হুলো বেড়ালের মত মুখ, পিটপিটে চোখ। দাওয়ায় উঠে কবাটে লাথি কষাল—এই, বুড়ো কোথায়। লাথির দাপটে কব্জা খুলে

গেল। খেদি ঝামটা দিয়ে উঠল : আ গেল যা! সরকারী কাম করি নাকি আমি যে বলতে যাবো? খুঁজে নেওগে।

গহীন রাত্তিরে আরেকদফা এল। গলির মুখে শুয়ে থাকা খেঁকি কুত্তার ল্যাজ মাড়িয়ে, খেঁকি কুত্তার ডাকে। আর কুত্তার মতোই তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়োর টুটাফাটা জোড়াতালি সংসারে। ঘুপচির মধ্যে তখন মৃতবৎসা নারী একমাত্র সন্তান বুকে চেপে গভীর ঘুমে মগ্ন। জানলার ফাঁক ফোকর দিয়ে সি আর পি'র বন্দুকের নল। কবাট ভেঙ্গে, হুলো বেড়ালের মতো মুখ অফিসার টর্চ ফেললো : শালা কেউটের বাচ্ছা!

—খবদ্দার, খবদ্দার বলছি।

—এ্যাঁ!

—দুখান করে ফেলবো।

আঁশ বটিটা খেদির হাতে বিষম বেগে কাঁপছে। রুগ্ন হাতের শিরা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। চিৎকারটা বটির চেয়ে মারাত্মক। বত্রিশ ঘর ঘুম ভেঙ্গে পাড়া মাথায় করল। সি আর পি পুলিশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে অনায়াসে তারা চলে এল। একে একে তারা আসছিল বোবা কালা সেজে :

— এ মাৎ যাও।

—গোলী কর দেগা।

নেপলার মা আগে। পিছনে মেয়ে-মদ্দার সারি। ছোট্ট একটা মিছিলের মতো এসে বত্রিশ ঘর ছেলেটাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। বেগতিক দেখে অফিসার ফৌজ নিয়ে কেটে পড়ল। ছেলেটা গিয়ে উঠলো নেপলাব মার কোলে। আঁচল সরিয়ে আঁচড়ে ছেলেটা নেপলার মার বুক খুঁজল।

—দস্যি ছেলে!

নেপলার মা ছেলেটার মুখ বুকে চেপে ধরল। আর সে নিশ্চিন্তে দুধ খেতে লাগল। চুক চুক শব্দ হচ্ছিল। রাখহরি সরলভাবে হাসল—নাহ্, বেটা অমর হবে।

খেদি থামে হেলান দিয়ে দূরের আকাশটার দিকে চেয়ে ছেলেটার মুখ নিয়ে কি সব ভেবে চলল।

যান্ত্রিক

ইস্পাতের পাত। লাইনগুলো সাত রাজ্যি টহল দিয়ে এখানে এসে কেমন জট পাকিয়ে গেছে। কালা ভইসের মত ঠমকে ঠমকে ইঞ্জিন আগুপিছু হটে। কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে ধোঁয়া ওঠে।

সেই ধোঁয়ার জালের মধ্যে টিনের চালা, লাইনের কাঠ বিছিয়ে বেঞ্চ। দূর থেকে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চালাটা ঠাহর হয় না। ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ওদিকে মন টানে না।

—আর সহন যায় না।

—ঠিক কথা।

—এই এক মানুষ জ্বালিয়ে মারলো।

—রামশরণ!

—তয় আব কই কি?

—এইটা একটা চিন্তার কথা।

নীল প্যান্টে আর নীল কুর্তায় মানুষগুলো ধোঁয়ায় মিশে আছে। ধোঁয়ায় তারা বসত করে। তাদের খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল। একজন খুক খুক করে কাশল।

—রক্ত ওঠে?

—না।

—তবু লক্ষণটা ভালো না।

—জানি। এখন আসল কথা বল।

—একটা লোককে সামলানো যাবে না!

—শাবল দিয়ে দেবো নাকি?

—নাহ্ থাউক!

গুজগুজ ফুসফুস অনেক্ষণ চলল। মাঝে মাঝে কমলা মাসীর গুড়ের চা। আস্তে আস্তে আন্ধার হলে যখন সিগন্যালের আলোটা মাত্র জেগে থাকল, তখন তারা একে একে উঠল।

রামশরণের সার্ভিস রেকর্ডে আজ অব্দি একটা কালির আঁচড় পড়েনি। পঁচিশ বছরের সার্ভিস। পুরোনো জামানার লোক। ঝড় বাদলা বৃষ্টি কিছুতেই কিছু না। রামশরণ বৃটিশ জামানার লোক। নিমকের কদর জানে সে।

—তুমি একা চালাবে?

—হ্যাঁ।

—মরো!

কোলকাতায় কত কাণ্ড ঘটেছে! কিন্তু কস্মিনকালও রামশরণকে কেউ নাগা করতে দেখেনি। সে বলে: মানুষের শরীল হল ইঞ্জিন। তা ইঞ্জিন যদি ফে'ল রাখ কলকব্জা বেকল হবে না?

হিক্কার মত একটা শব্দ তুলে সব্জী গাড়ীটা অকস্মাৎ থেমে গেল। ঠিক কেবিনটার নাগাল পেয়েই। ড্রাইভার রামশরণ ভ্যাকুম খুলে দিয়ে প্রেমসে বিড়ি ধরাল। লাইনম্যান কটকবাসী বিজু ম্যাড়মেড়ে লাল নিশানটা অভ্যাস মাফিক নাড়ছিল। বিজু পানের ছোপধরা দাঁতের পাঁজা বার করে হাসলো। রামশরণের জিভ আর বাগ মানল না: কিরে উচ্ছব না কি?

—জানো না?

—কি?

—আজ আর টেরেন নেই।

রামশরণ খেঁকিয়ে উঠল: হাতীর পাঁচ পা দেখেছিস না? ছাপড়া জেলার দেহাতী হিন্দি ছেড়ে সে এখন বাংলা বুলি শিখছে।

নাইট ডিউটির এই এক জ্বালা। একে তো কয়লাকুচো আর ধোঁয়ায়

অমনিতেই চোখ লাল লাল হয়, জ্বলন ধরে। নাইট ডিউটিতে সেই চোখ পুড়ে অঙ্গার হবে। হরিপাল ছাওয়ালপানের জন্য বারো আনার পাবদা মাছ নিয়েছিল। ইঞ্জিনের গরমিতে সেই মাছ ভাপে সেদ্ধ।

—আজসে স্থরু ?

—হ্।

—কাম মে আয়গা ?

হরিপালের ব্রণ-বসা শুকনো মুখখানা প্রশ্নের ধরণ দেখে কদাকার হল বিরক্তিতে। কিন্তু যতক্ষণ ইঞ্জিনে আছো সমঝে চলতে হবে। রিস্‌কের চাকরী। বয়লারে কয়লা ফেলতে ফেলতে সে আগুনের ভাটা আর রামশরণের মুখটা পরপর দেখল। বেলচার হাতলটা মাজার কাছে ঠেকিয়ে সে খটখটে বিষম লাল দুটো চোখ মেলে ধরল রামশরণের দিকে : তোমার কি দরকার অত খোঁজে। রামশরণ হকচকিয়ে গিয়েছিল।

—কিরে মারবি নাকি।

—অ্যাঁ।

—গিলে ফেলবি মনে হচ্ছে।

হরি বিকটভাবে আলজিভশুদ্ধ বের করে হাসতে লাগল। কাঁচের টিউবে সিসের বলটা জলের মধ্যে লাফাতে লাগল। ঐ বল হল ইঞ্জিনের পরাণ। জল কমে গেলে কিম্বা প্রচণ্ড উত্তাপে যদি কোনক্রমে সিসে গলে যায় তাহলে আর রক্ষে নেই। ইঞ্জিনটা তখন ভীষণ শব্দে ভেঙে যাবে। রামশরণ গোঙরাতে লাগল। হরির হুঁশ ফিরল। সে পানি ঠিক করল। সিগন্যাল পেয়ে গাড়ি টিকিস টিকিস করে চলল। রামশরণ হাতের তেলকালি মাখা জুট দিয়ে মুখটা মুছল। হরি দেখেও দেখল না। মানুষটা অমন গলতি আকছার করছে। হরি ওয়াটার ট্যাঙ্কের পাশ থেকে রুমালে বাঁধা মাছের পুঁটলীটা নামিয়ে নাকের সামনে এনে শুঁকল। না, গ্যাছে। হায়রে কতকাল পরে একটু মাছ! দুত্তোর!

—এ হরি।

—কি ?

—বাত কেয়া থা ?

হরি জবাব না দিয়ে বয়লারে কয়লা ফেকল মাজ্জা ভেঙে। তারপর কর্কশভাবে বলল : বাত আর কি। চাল নিয়ে এক বুড়ীর সাথে কি ঝামেলা ওয়াচম্যানদের। বুড়ীটার হয়ে বলতে গেছিল সেকেণ্ড ফায়ারম্যান সদানন্দ। সদানন্দকে ওয়াচ-ম্যানরা দল বেঁধে ঠেঙিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এখন তখন অবস্থা। এই তো বিত্তান্ত।

–বৃটিশকা টাইমমে···।

—থামো তো।

হরির অচ্ছেদ্দা ধরে গ্যাছে। এখন ট্রেনটা ইন্ করলে বাঁচে। না হলে কি থেকে কি হয় বলা মুশকিল। কালই তো শাবল দিয়ে দিচ্ছিল শেষ করে নেহাৎ···। গাড়ীটা যখন প্ল্যাটফর্মে ইন করে তখন একটা ঘটাং ঘটাং শব্দ ওঠে। ট্রেনটা ইন করল। সবজির ট্রেন। হরি রড ধরে ঝুলে পড়ল। পক্ষীরাজের মতো। তার কপাল ঢাকা নীল রুমালটা কোন অজানা দেশের পতাকার মতো উড়ছিল।

—এ পাল!

—বলো।

—এ্যাতনা রিস্‌ক লেনা ঠিক নেহী। মালুম হ্যায় আভি ইলেকট্রিক হো গিয়া।

—জিন্দেগী'ই রিস্‌ক।

সবজির গাড়ী ধোঁয়া উগরে থামল। ভেণ্ডাররা হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল। রামশরণের তর সইল না। সে চটপট নেমে ফাল দিয়ে টিশন চষে ফেলল।

—কুলী লোগ ভি বিগড় গিয়া।

—তুমি তো আর বিগড়ে যাও নি।

—উ বাত নেহী। সাহেব ম্যাসেজ পাঠিয়েছে, সেকেণ্ড ট্রেনে কাজ করতে হবে।

—মরো।

এক ডিউটি ক্লার্ক ছাড়া শেডে জনমনুষ্য নেই। ক্লীনার পঞ্চা শেডের পাঁচিলে বসে মস্করা মারছিল। পঞ্চাকে দেখে হরি সন্দিগ্ধ হল। তবে কি মানুষটা গ্যালো। লিক লিকে পঞ্চা পিচ কেটে থুতু ফেলল। রামশরণের মুখ চুলবুল

করে উঠল : লাষ্ট টাইমমে তুম ভি। পঞ্চার পোকায় খাওয়া নীল দাঁতটা বেরিয়ে এল। ইঞ্জিন উড়াল দিয়ে শেডে নিয়ে এল। হরি ডিউটি ঘরের পাশে চাপাকলে হাত মুখ ধুয়ে ফেলল। পকেট থেকে এককুচো সাবান বের করে মুখ ঘষলো। সাফসুফ হল। রামশরণ সাততাপ্পি দেওয়া জুতো জোড়া খুলে, পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে সাঁৎসেতে হাজা চুলকোচ্ছিল বসে বসে। লোকটার জন্ত হরির দুঃখ হয় : সার্ভিস রেকর্ড অক্ষয় অমর করতে গিয়ে লোকটা নিজে না মরে।

—সেকেণ্ড ট্রেনে কাম করবে তাহলে ?

—জরুর।

—জাহান্নামে যাও। আমার কি ?

সাফ সুতারা হয়ে সাইড ব্যাগটা কাঁধে ফেলে পচা মাছের দুঃখে শরীরের ক্লান্তিতে সে লাইন ধরে এগোল। যে লাইন দিয়ে স্ট্যাস্কবি আর ফিলিপ্‌সের লেবাররা কাজে যায়, ঘরে ফেরে। হাজা চুলকোতে চুলকোতে রামশরণ দেখল হরি চলে যাচ্ছে। রামশরণের গতরে দরদ জাগছিল। চোখ টাটাচ্ছে। রাত-জাগার ক্লান্তি আর ইঞ্জিনের ধকলে। ভুখও লেগেছে জব্বর! রামশরণ কমলা মাসীর ঘুপচির সামনে ব্যাটারীর বাক্সে বসলো।

—চারটে কচুরী।

—চা খাবা না ?

—হ্যাঁ।

—ডিউটি খ্যাষ।

—নাহ্‌। আবার ছুটতে হবে।

—ক্যানে !

—ডবল ডিউটি।

—আইজ আবার কিসের ডবল ডিউটি।

মাসীও খোঁজ রেখেছে। গলার ঝাঁজে মালুম হল, তার সমর্থন আছে। মাসীর ভ্যাপসা চোখ দুটো বিস্ময়ে মানুষটাকে দেখছিল। কেমনতরো মানুষ! তড়াক করে পয়সাটা ছুঁড়ে দিয়ে রামশরণ উঠল। মাসী ততক্ষণে হাত চেপে ধরেছে। রামশরণ ভীতভাবে চারিদিক দেখল।

—কাজটা ভালো করতাছো না।

—কি ?

—বুড়া হইছ, ওস্তাদ বইলা ডাকে। তাই। নাইলে কামটা তুমি ভাল করো নাই।

রামশরণ আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল : ছাড়ো ছাড়ো। রামশরণ হন হন করে শেডে চলে এল। ইস্পাতের পাত। নিঃসঙ্গভাবে রেল লাইনগুলো যেন মৃত্যুর অপেক্ষায়। অতঃপর কারা যেন রেল লাইন উপড়ে ফেলবে। ইঞ্জিনগুলো অবসন্নভাবে ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে। ধোঁয়া নেই। কেবল ঐ যা সেকেণ্ড ট্রেনের সাতান্নর আপ ইঞ্জিনটা থেকে থেকে গরল ঢালছে। শেডের আবহাওয়ায় উত্তাপ নেই। রামশরণ ফাঁকা নিরালা লোকোশেডে ভীষণ অসহায় বোধ করছিল। পঞ্চা একটা রেইঞ্জ নিয়ে ইঞ্জিনে চড়ল। পঞ্চার মতলবটা কি! রামশরণ ভাবল কি ভাবে সে এই ফচকে বদমেজাজী ছেলেটার সাথে ক্যানিং অব্দি যাবে। এমন সময় আবার মেসেজ এল। জলদি ট্রেন নিয়ে যেতে হবে। টাইম কভার হতে চলল। ফেল করলেই চার্জশীট। এতদিনের সার্ভিস রেকর্ড। রামশরণ হাঁক দিল : এই পঞ্চা!

পঞ্চা যেন খুব চমকে উঠল ডাকটা শুনে। সে ইঞ্জিনের চাকার ভেতর থেকে ইঁদুর ছানার মতো বেরিয়ে এল। আর অযথা হাঁপাতে লাগল।

—সব ঠিক হ্যায়।

—হু।

পঞ্চার কোটরে বসা ম্লান চোখ দুটো চিক চিক করছিল। রামশরণ ধীরে ধীরে ইঞ্জিনে চাপল। আটটা সাতান্ন'র আপ। আর লেট করলে চলে না। ভ্যাকুম টানল। চোখ পিট পিট করে সে পানি দেখল। পিষ্টন চেক করল। তারপর সিটি বাজিয়ে উড়াল……। ইনজিন বিগড়ে বসল। আগেই রামশরণের মনে কু ডেকেছিল সে পাত্তা দেয় নি। চোখ দুটো ধক্ ধক্ করতে লাগল।

—এ পঞ্চা!

—আমি কি জানি।

—হাড় ভেঙ্গে দেব।

—আমি জানি না ওস্তাদ।

—আমার রেকর্ড খারাপ করলি···তোর নকরি খেয়ে দেবো।

—ওস্তাদ!

ক্রমশঃ ভয়ে সিঁটিয়ে যেতে লাগল পঞ্চা। রামশরণ ধীরে ধীরে জন্তুর মতো থাবা বিছিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল···বে-ই-মান। লিকলিকে পঞ্চা সরতে লাগল। বয়লারের আগুনের হলকায় তাদের মুখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

পঞ্চা চিৎকার করল : ওস্তাদ ইমান কাকে বলে?

কথাটা বিদ্যুতের মতো সাংঘাতিক শক্তিতে রামশরণকে ছিটকে ফেলল ওয়াটার কলামের সামনে। কথাটা শোনার সাথে সাথেই সে ছিটকে এল। সওয়া হাত জিভ বের করে গ্রীষ্মকালীন কুকুরের মতো হাঁপাতে লাগল।

আশ্চর্য! রামশরণ নালিশ ঠুকল না। সেদিন সেকেণ্ড ট্রেন থেকে সমস্ত ট্রেন বন্ধ ছিল। ওয়াচম্যানরা ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। আর সেকেণ্ড ট্রেন সম্পর্কে ড্রাইভার রামশরণ রিপোর্ট দেয় : যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ইঞ্জিন অচল।

আকাল কন্যা কুসুম

বংশ পরিচয় :

জাতে মালো। মাছ মেরে খায়। মাছুয়া। মাছুয়া বলাইর সম্বল : একটা খ্যাপলা জাল, আড়কাঠি, আর সাত ফলার কোঁচ। আর হাওলাত দুশো টাকা তেরো আনা চার পাই। টানাজাল, জালকাঠি এসব কেনা ক্ষ্যামতায় কুলোয় নি কুসুমের আজা বলাইর। তার জন্যে আছে আড়তদার মহাজন ছিনাথ বাবু। জেলে ডিঙ্গি নেই। তার জন্যেও ছিনাথ বাবু। মাগের পাছায় কাপড় নেই। তার জন্যেও ছিনাথ বাবু। নদী নালায় বুকে হেঁটে যা কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনবে সেটুকু স্বধু তেনার পায়ে ঢেলে দিতে হত। তার থেকে সুদ কাটান যাবে, নৌকো জাল

বাবদ যাবে আরো কিছু, পাইকিরি বলে ওজনের মা বাপ থাকবে না। হ্যাঁচকা ওজন হলে কি হবে, একটু নুন তেল আর দু সের চাল আর কোমরের খুঁটে লাল ডবল পয়সা দু চারটে নিয়ে কুসুমের আজা বলাই ঘরকে যেত। সে ঘরটাও এক বার ঝড়ে পড়ল মুখ থুবড়ে। আজার তখন দেড়কুড়ি চলছে। তালপাতা পাড়তে গাছে উঠেছিল। সেই কাল হল। তালপাতার ছাউনী দিল ঠিকই। কিন্তু লড়বড়ে হাত আর বুকের একটা ব্যথা নিয়ে তে রাত্তির কাটাতে পারল না। সেই নিয়ে সমুদ্রে গেল। ফি সন যেমন যেত। মরশুমের ভাসান। সম্বৎসরের খোরাকী আসত যা থেকে। কুসুমের আইমা তেল সিন্দুর দিয়ে পানির বন্দনা করেছিল, তবু আজা ফেরেনি।

আইমার ছিল মাজা মাজা রঙ। আড়তদার ছিনাথবাবু সেই রঙ চাটত এসে রোজ। আর মেটে হাঁড়িতে দুইপর বেলা আধখানা প্যাঁজ, এক আধ সের চাল আর গোটা তিনেক আলু সেদ্ধ হোত। আর আইমার কালা রঙ ধলা হতে লাগল। শেষে সাদা হয়ে গেল। শ্বেতবানি হল। মালোপাড়া বলত: পাঁচ ভাতারীর ব্যামো, রাঁঢ়িগিরি করলে নির্ঘস এই হবে। এ রোগে টাঁ্যাকে না। কালো ডবকা একটা মেয়ে রেখে আইমা শ্বেত বালিতে সাদা হয়ে মরল। মেয়ের নাম বাসন্তীবালা। মালো পাড়ার জোয়ান মদ্দ ধীরেনের সাথে বাসন্তীবালার বে হল। বছর তিনেক সুখে দুঃখে কাটতে না কাটতে ধীরেন ছিনাথবাবুর সুদের খ্যাপলা জাল গলায় জড়িয়ে খাবি খেতে লাগল। পাট জোয়ান বৌটাকেই সুদ বলে ধরে দিল। রোজ রাতে দিয়ে আসত নিয়ে আসত। শালবনে যে বাঘ থাকে! বাসন্তীবালাকে একা ছাড়তে ধীরেনের ডর লাগত। ধীরেন যে বাসন্তীবালা বলতে মূর্চ্ছা যেত। কুসুম তখন তিন বছরের টুকী। ধীরেনের ঔরসে বাসন্তীবালার গর্ভে কুসুমের জন্ম। কুসুম যখন চার বছরের তখন বাসন্তী-বালার পেটে আরেকটা এল। ধীরেন ফণা তুলেছিল: মহাজনের টোকা আমি পালব কাই? ছিনাথ আড়তদার বাসন্তীর পেট খসাতে হাতুড়ে বদ্যির কাছে নিয়ে গেছিল। টিনের পাত দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বদ্যি বাচ্ছাটাকে শেষ করে ছিল। আর বাসন্তীকেও শেষ করেছিল। সেই যে রক্তস্রাব শুরু হল মরার আগে আর তা থামেনি। এই বাসন্তীর কন্যা কুসুম। ধীরেনের কন্যা কুসুম।

কুসুম মানে পুষ্প। ফুল। মরার আগে বাসন্তীবালার হয়তো ফুল ভালো লেগেছিল। তাই নাম রাখল কুসুম। তার আগে কুসুমের কোন্ নাম ছিল না। টুকী বললে সাড়া দিত। খলখল করে উঠত। টুকী মানে মেয়ে।

কুসুম যখন পেটে এল সেবার দারুণ আকাল। পাড়াপড়শী মেয়েটাকে ডাকত আকালী বলে। সেই থেকে নাম হল : আকাল কন্যা কুসুম।

কুসুমের হাউস ॥

রাঁঢ়ির ঝি রাঁঢ়ি হবে। তিন পুরুষ রাঁঢ়ি হলে তো জাত ব্যবসাই হয়ে গেল। মালো পাড়ায় এমন দু দশ ঘর আছে। আর সব ঠেকে বেঝে গেলে তবেই ও রাস্তা মাড়ায়। কুসুমের গায়ে বাঁকা চোখ লাগতে শুরু করেছে। ফরেষ্টার থেকে মোক্তার বাবুর ক্যাবলা ছোঁড়াটার চোখে অব্দি রস এসে যায়।

অথচ কুসুম ছুঁড়ির বয়েস আর কত। তেরো পোরেনি এখনও। এরি মধ্যে বুকে মাজায় ভারী হয়েছে। বাপ বেটির পেটেরটা কুসুমই যোগাড়যন্তর করে। ধীরেন গোসাপের মতো পড়ে থাকে কুঁজো ঘরে। শামুক গুগলা। শুশনি শাক ব্যাঙের ছাতা যোগাড়যন্তর করে মেয়েটা দিনাদিনি একবার কিছু না কিছু ফোটায় ঠিক। ব্যাঙের ছাতা তোয়াজ করে রাঁধতে পারলে তো শোল মাছকে বলে ওদিক থাক। সোয়াদ যা খোলে একেবারে অমরেত্তো। হ্যাঁ! একলাগাড়ে যদি ঐ জাবনাই পেটে চাপান দিতে থাকো তবে ফুস্কুরি উঠবে নির্ঘস। মুক্তোর মতো টলটল করবে পুঁজ রস নিয়ে। সেই ঘা সহজে আর ছাড়তে চায়না যতোই শেকরবাকড ঝাড়ফুঁক করাও না। ব্যাঙের মুণ্ড থাকে যে। কুসুমের লাগু পায় নি এখনও। বাপসোহাগী কুসুম।

ফরেষ্টারের কোয়ার্টার ডিঙ্গিয়ে বুনোঘাস আর শাল গাছের সারির ভেতর দিয়ে বুকে অন্ধকার সাপটে নিয়ে, শুশনি শাক নিয়ে, কুসুম ফিরত। তেরো বছরের টুকী। ভিটকপালী আগুনখাকী মা কুসুমকে খালাস দিয়ে চার বছরের

ভেতর নিজেও খালাস নিয়েছিল। শেষের দিককার দিনকটা বাসন্তী দিনরাত্তির গাল পাড়ত : সৌতুনের ঝি সৌতিন! রাঁঢ়ির ঝি রাঁঢ়ি! আতুর ঘরে মুখে মালসার আগুন ঠেসে দিলাম না কাই?

আর তেরো বছর বয়সে কুসুম মা দিদিমার নাড়িনক্ষত্র জেনেছিল। বাপ ছাড়া কোন মরদের কাছ ঘেঁষত না। আর মনে মনে দিনরাত্তির ভাবত : আপদ যাবে কবে! এ্যাই! বাপ তো কি হয়েছে। মাথায় গিয়ে লাচবে নাকি। হুঁ, বনের বাঘ খেদাত। মল্লে কুসুম হালকা হয়। ওদিকে আবার গোসাপটার সামনে সাঁঝের মুখে চাট্টি তুলে না দিলে কেমন ম্যাজ ম্যাজ করতো। শত হোক বাপ। জম্মো দিয়েছে।

সেই কুসুমের মনে হাউস জাগল। ঘর বাঁধার হাউস। একটা শখ বটে! লেশা বটে! কিন্তুক ইটা না থাকলে মানুষির থাকেটা কি?

জাত বেজাত পাড়াপড়শী শত্তুর মিত্তির সব ঐ এককথা ভেবেছিল। মালো পাড়ার নিয়ম ইটা। ই হবেই। বয়সির ধম্মো। কুসুমের চোখ দেখনি কাই?

হয়ত তাই। বয়েসকালে পোড়া চোখের ছটপটানি বাড়ে। ল্যাটা মাছের মতো মনটা চিগির দিয়ে ওঠে। আবুঝ বেবুঝ মন।

আর সে রাতে শাল বনের মাথায় পিচকিরি দিয়ে লাল রঙ ছুঁড়ে মেরেছিল কে যেন।

ফিসফিস করে মরদটা কুসুমের নরম কানের লতি চিবিয়ে খাচ্ছিল : কাল দুফোর বেলা আইসিব। আনেক কথা আছে। তুই যে ফিতা চাইতিলু সি ফিতাটা লিয়ে আস্‌সি। দেরী করবিনি! পট করে আইস্‌বু।

কুসুমের বাপের কথা মনে পড়েছিল। ধীরেনের কথা। বাপের নাকি কঠিন ভালবাসা ছিল। কঠিন ভালবাসা। কুসুমের বোধভাষ্যি কম। ভালবাসা, পিরীত, রঙ—এসব আবার কি। শরীলের টানটা কুসুম তেরো বছরেই বোঝে। কিন্তু মা আর আইমার কথা ভাবলেই ভালবাসাটা কেমন ঘোলা জলের মতো লাগে। চোর বানের মতো মনে হয়। কুসুম বোঝে না।

ভাবে : আছে হয়তো। কুসুম জানেনা। যে জন্যে বাপ শালবনের ভেতর দিয়ে ঘুটঘুট্টি রাতে ছিনাথবাবুর কোলে দিয়ে আসত মাকে।

যদি বাঘে খায়। আবার সাথে করে নে আসত। এরই নাম ভালবাসা। কুসুম কি কাখোয় ভালবাসে? হুঁ হুঁ বাসে। নিজের পেটটা টাটালে বাপের পেটটার কথা মনে হয়। কুসুম নির্ঘস বাপকে ভালবাসে। নিজের পেট ছাড়া মানুষ আর যার পেটের কথা ভাবে তাকে সে নির্ঘস ভালবাসে।

ফিতের কথা বলেছিল মরদটা। বড় বোয়া। ছাতি তো লয় যেন নিড়েন দেওয়া ক্ষেত। লোম কি রে বাপ! বলে কিনা—ফিতাটা লিয়ে আসসি। ফিতা বেঁধে যেন স্বগ্‌গে যাবে কুসুম। মরণ!

তিনদিনের শুখা পেটে হাত দিয়ে বড় বোয়ার সাধের মেয়েমানুষটা ফোঁস করে উঠেছিল: ভাত দিতে পারবি? ভাত!

বড় বোয়ার হাসির বহর কি! যেন দুধ ওগড়াচ্ছিল: পাছার কাপড় লিবি নি কাই!

কুসুমের কালো মাথার ওপর নাল ফুলের চাঙর আর সামনে মরদটার বুকের ছাতি।

হক হাসি পেল এবার: ন ন্ না, ন্যাংটো হয়ে খিল দে থাকবো হুঁ···কিন্তুক ভাত চাই···জীবনভর তুকে খাওয়াতে হবে···শেষে বলবি···

: ধুস!

বড় বোয়া পাকা রাস্তা থেকে কাউখালী নিশ্চিন্দিপুর অব্দি রিক্সা টানে। নিজেই কিনেছিল গাড়ীটা। জমিন বেচা টাকায়। দিন দু তিন টাকা হোত। বড় বোয়া মানুষ ভাল। কুসুম নজর করেছিল মহল্লার আর কোন মেয়ের দিকে ওর চোখ নেই। বাপ যেদিন চোখ বুজল সেদিন সাঁঝেই কুসুম রিক্সাওয়ালার ঝাঁপে ধাক্কা মারল: কবাট খুলিস নি কাই?

মালোপাড়া রঙতামাসার কথা বলল। বড় বোয়ার ইয়ার দোস্ত মজা মেরে গেল: রাতটুকুনও তর সইল নি! আর কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার শালবনের মাথার ওপর থেকে লাল রঙের ছোপটুকু মুছে ফেলল। অন্ধকারে কুসুমের ভয় লেগেছিল, খিদে পেয়েছিল। গোটা পেটটা গুলিয়ে উঠেছিল অসহ্য এক খিদেয়। রিক্সা

নিয়ে বড় বোয়া মুড়ি চিঁড়ে পাউরুটি ছাইপাঁশ যা হোক আনতে বেরিয়ে গেল। একা থাকতে কুসুমের ভয় করল না। সকালবেলা বাপ মরেছে। বাপের কথা ভেবেও ভয় লাগল না। এখন কুসুমের একটাই হাউস। পেট ভরে খাবে।

কুসুমের কন্যালাভ ॥

গতরে বাতাস লাগিয়ে কুসুম ঘোরে না। আর সাঁঝ না লাগতে সাবান লাগিয়ে গা হাত পা ধুয়ে পাখলে মোক্তার বাড়ীর বৌ বিটির মতো সিঁদুরের টিপ পরে পটের বিবিও সাজে না। হাটের নষ্ট মেয়েমানুষের মতো বায়োস্কোপের গানও গায় না। মালোপাড়ার কোন মাগী সোয়ামীর ওপর বসে খায়? কুসুম আমন আউশের টাইম উলিড়া করে (বীজ ধান শুকিয়ে নেয় ঢেলে)। পাকা রাস্তায় ঘুঁটে দিয়ে তো কুঠ ধরিয়ে দিয়েছে। দু চার পয়সা যা হয় বড় বোয়া ঠেকলে ঝোকলে বের করে দেয়।

আর সাঁঝ গড়িয়ে রাত···রাত কেটে ভোর···ভোর থেকেই দু ফোর···কত দিনই তো গেল। বড় বোয়ার জন্যে কুসুমের এখন দরদ হয়। নিজের মুখেরটা রেখে দেয় বড় বোয়ার জন্যে। পেটটাই কি বড়ো নাকি। কুসুম কি ভালবাসতে শিখে গেল—এ্যাই!

বড় বোয়ার মাথায় কিন্তু এখন আখ না আখ আগুন চড়ে। খরখর করে জিভ। তেমন তেতেপুড়ে গেলে চড়চাপড় তো আছেই। কুসুম গায়ে মাখে না। মাগের গায়ে মরদ হাত দেবে নাতো দেবে কি ভিন পাড়ার মুদী? আর কথায় বলে দুধ দেয় গরু তার লাথি সহ্যি হয়। কিন্তু দুধেই এখন টান লেগেছে। সেই টান গিয়ে পৌছেছে কুসুমের ঢালা চুলে। আর যায় কোথায়!

: খবদ্দার, চুলে হাত দিবি তো···।

: ই, তেজ! তেজ!···আখ, আখ।

চুলের সাথে রক্তের ফোঁটা উঠে এল। প্রথমবার কুসুম ভালোমুখে মানা করেছিল। মঙ্গলামঙ্গলের কথা বলেছিল। ভাতারের রাগ হলে, শরীলে জলন

লাগলে মাগকে ধরে পিটবে এ আর বেশী কি। তাই বলে চুলে হাত! বড় বোয়া কি রামায়ণ শোনেনি? মনে নেই রাবণের উপাখ্যান? অমন যে সোনার লঙ্কা তাই ছাড়েখাড়ে গেল সীতার চুলে হাত দিয়েছিল বলে।

কাগের মতো কালো একগোছা চুল হাতে নিয়ে কুসুম পাকা রাস্তার পাশে বসে থাকল ঠায়। বড় বোয়া রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ও শত্তুর আজ দূর করে দেবে। একে তো খদ্দের নেই। বলে মানুষের পেটে নেই ভাত, তার রিক্সা। দু'চার ঘর বাবু যা ছিল তাও নোকরি চাকরী নিয়ে হিল্লী দিল্লী কোলকাতা চলে গেছে। মালোপাড়ার সাতবাসী পোড়া হাঁড়ি লাঠি মেরে কে যেন ফাটিয়ে দিয়েছে। পেটের আগুনে মালোপাড়াও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঠিকা কাম নিয়ে কে কোথায় ছিটকে গেছে। মালোপাড়ায় এখন আর কোঁদল ক্যাঁচালির সাড়া নেই। আকালের টাইমে নাকি এমনিই হয়। আকাল আসছে, আকাল। পেটে দানা নেই মানুষের, রিক্সায় চাপার হাউস নেই কারো।

আকাল কন্যা কুসুম একগোছা চুলের ভেতর সর্ষে দানার মতো রক্তের কোঁটার দিকে তাকিয়ে আকালের কথা ভাবছিল। আকাল মানে: গরীব গরবার পাইকিরী মিত্যু। মার থানে যেমন বলি হয়। তেমনি দশ বিশ বছর বাদ বাদ আকালে গরীব গরবা জবাই করে। কারা করে? ছিনাথবাবু? দারোগা বাবু? মোক্তারবাবু?

আবার কুসুমের আমসি চোখ গিয়ে পড়ে চুলের ভেতর। গোবরের নাদায় মাছি ভনভনিয়ে উড়ছে। কুসুমের বুকে এসে বসছে। হঠাৎ পেটের ভেতর একটা ডেলা মতো নড়ে উঠল। কুসুমের সন্তান। আকালে সন্তান এসেছে কুসুমের পেটে।

আচ্ছা বড় বোয়া কি চায়? কুসুম গোলায় যাক? বাপের মতো বড় বোয়াও কি কুসুমকে গোলায় দিয়ে আসবে? হাতে সড়কি নেবে শাল বনের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়? তখন কি আবার শাল বনের মাথায় কেউ রঙ ঢেলে দেবে? লাল রঙ?

আতুর ঘরে মুখে মালসার আগুন ঠেসে দিলাম না কাই?

কুসুমও ভাবে: কাই? কাই? কাই? আর ভাবে, পেটেরটা যদি

মেয়ে হয় তো তাই দেবে। নাহলে গলায় পা তুলে দেবে। কাউখালী খাজরীতে আর টুকী হবে না। টুকী থাকবে না।

রক্তের দানা শুদ্ধ্ চুলের গোছা গোবরে ঠেসে কুসুম পাকা রাস্তায় থপাস করে মারল : পাঁচ আঙুলের দাগ নিয়ে রাস্তার বুকে ঘুঁটে ফুটে উঠল। আর হঠাৎ কুসুম বেবাক ভুলে গেল।

মিলিটেরী ভক্ষণ ॥

হাওলাতে হাওলাতে বড় বোয়ার লোম শুদ্ধ্ বিকিয়ে গেছে। ঝরঝরে, জঙ ধরা রিক্সা বেচে আর কটা পয়সা পাবে? সব শোধবোধ দিয়ে হাতে থাকল তিরিশটা টাকা। বড় বোয়া রিক্সা বেচে তিনদিনের দিন দেশান্তরী হল। নিরুদ্দেশ। চাটাইয়ের তলায় দশ টাকার একটা আস্তো লোট রেখে গেছিল কুসুমের জন্যে! দরদ! ভালবাসা!

ভেবেছিল মার কথা মত মালসার আগুন ঠেসে দেবে মুখে। এক ফোঁটা ছানাটার গলায় পা তুলে দেবে। তারপর গোড়ালীর একটা মোচড়। কোমরে একটা ঝাঁকি। আর দাঁতে ঠোঁট কামড়ে একটা বিষ ব্যথা পিষে ফেলবে যাঁতাকলে। ঠ্যাং দুটো নাড়িয়ে এক রত্তি মেয়েটা যখন ডুকরে উঠল, কুসুমের মমতা জাগল। অদ্ভুত মমতা। মালোপাড়ার কুঁজী বুড়ী ফুল কাটতে এসে বলে গেল : টুকী হয়েছে রে কুসুম। টুকী! কুসুম জানত না ওর মনটা এমন তুল-তুলে। কাদাকাদা। মেয়েটার মুখে মাইয়ের বোঁটা ধরে দিয়ে কুসুমের মন গলে যেতে লাগল···ফোঁটা···ফোঁটা করে। আর হঠাৎ নাইকুণ্ড সমেত তলপেট যেন ফেটে যেতে চায়। পাঁজরার তলায় পাতলা চামে ঢাকা যে একটা খোল আছে মানুষের। পেট। পেট। পেট।

কবে যেন ব্যাঙের ছাতা খেয়েছিল, কুসুমের এখন ঘা হয়েছে। পচা ঘা।

গোটা কাউখালী গরম লোহার শিকের মতো রোদে পেট বিঁধিয়ে পড়ে আছে। ব্যাঙের ছাতা না গজাতেই মানুষের হাত কুচ করে ছিঁড়ে নেয়। শুশনি শাক উধাউ। শামুক গুগলীর বংশ মরে গেছে। কাউখালী রিলিফের খিচুড়ির জন্যে চোয়াল ফাঁক করে রেখেছিল। রিলিফের বদলে এল মিলিটেরী। ফরেষ্ট আপিসের সামনে। ষ্টেশনের সরকারী গুদামের টিনের নিচে। মরে হেজে রুখাশুখা দু দশ ঘর যারা টিঁকে আছে তারা নাকি এবার মিলিটেরী ধরে খাবে। জোর গুজব।

কুসুমের ঘেন্না ধরে গেছে। মানুষ জাতটার ওপর। বড় বোয়ার কসুর নেই। খাওয়ানোর ক্ষ্যামতা নেই, ছেড়ে গেছে। হাতে ধরে আর গোলায় দিয়ে আসতে পারে না। ভেবেছে, গেলে একলা যাক। নাহ্, ভালবাসত বটে মানুষটা! কঠিন ভালবাসা!

ন্যাতার শেষ ফালিটা অব্দি ফেঁসে ফেঁসে সুতো হয়ে গেল। ঘরে খিল দিয়ে কুসুম ন্যাংটো হয়ে থাকে দিনভর। কিন্তু পেট তো শুনবে না। আর যে ছানাটা কুসুমের বুক খাবলে পড়ে থাকে তার মুখেও তো তুলে দিতে হবে দানা। কথায় বলে: দানা না খেলে হয় কানা।

তবে কি রাঁড়ি হবে? গোলায় যাবে নাকি? নাহ্, দরকার হলে মেয়ের গলায় পা তুলে দেবে তবু গোলায় যাবে না। মাটিতে আছড়ে ফেলে পেটটা ফাটিয়ে ফেলবে ব্যাঙের মতো। কিন্তু না, গোলায় যাবে না কুসুম। তার থেকে কুসুম জন্তু হবে। মানুষ থেকে কি ছাই লাভ হচ্ছে। যে বাঘের ভয়ে বাপ সড়কি নিয়ে যেত শালবনে, কুসুম সেই বাঘ হবে। এক হপ্তা পেট বেঁধে কুসুম নিশুতি রাতে চুল ছেড়ে বেরিয়ে এল। ফিরল খানিকটা ভাত আর রুটি নিয়ে। আশপাশের দশটা গাঁয়ে গেরস্থরা ডাইনের ভয়ে রাতে জল করা বন্ধ করে দিল: নেবে গো চাট্টি ভাত! দু চারজন সদর হাসপাতালে ভিরমির চিকিচ্ছে করাতে গেল।

রাঁড়ির ঝি কুসুম রাঁড়িগিরি ঠেকাতে ডাইন হয়েছে। ছ মাসের মেয়েটার নখ হয়েছে এক আঙুল। আর মিলিটেরী খাওয়ার খবরটা কাউখালী থেকে জেলে-ডিঙ্গি করে চাপান অব্দি চলে গেছে।